দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ১৬ জুন - ২০১৪।।
১ আষাঢ় - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

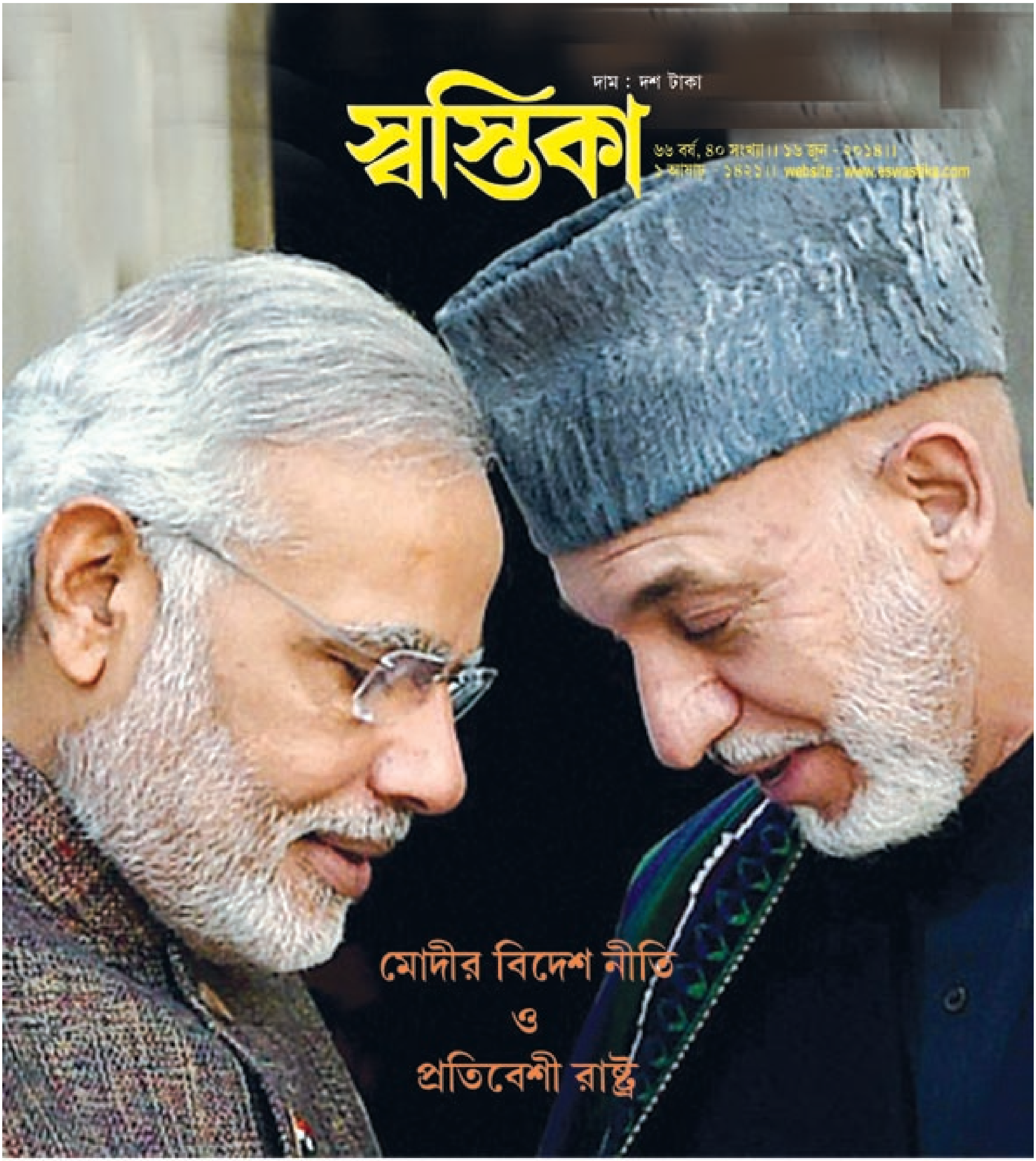

মোদীর বিদেশ নীতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র

ভারত কি আগামী দিনে সত্যিই কংগ্রেসমুক্ত হতে চলেছে?

—পৃঃ ১২

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও ক্ষমতা

—পৃঃ ২৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

রাজ্যের জনমত দ্রুত বিজেপির পক্ষে যাচ্ছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : রসে থাকলেই বসে থাকবে □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

ভারত কি আগামী দিনে সত্যিই কংগ্রেসমুক্ত হতে চলেছে? □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১২

ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র □ মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) □ ১৪

ঢাকা মানেই আওয়ামী লীগ নয়— দিল্লীকে এখন এটাও বুঝতে হবে □ সাধন কুমার পাল □ ১৬

নেপালের প্রাচীন নগর ভক্তপুর □ ২১

বট-সাবিত্রী ব্রত □ শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল □ ২৩

ষোড়শ নির্বাচন মধ্যবিত্ত মর্যাদাবোধের পুনরুত্থান □ গুরুচরণ দাস □ ২৭

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও ক্ষমতা □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ২৯

ছাত্র-শ্রমিকদেরও বিএমএস ও এবিভিপি-কে চেনাতে হবে □ শ্যামল কুমার হাতি □ ৩১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

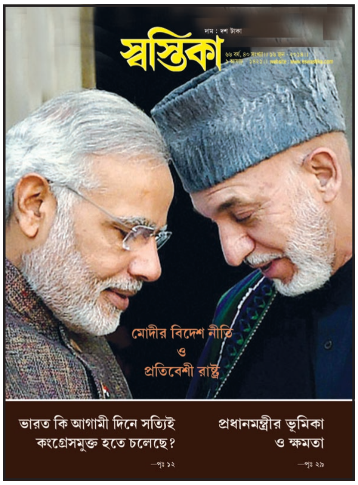

পৃঃ ১৪ - ১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৩ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮

□ □ খেলা : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ১৬ জুন - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৩শে জুন ২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৩শে জুন ২০১৪

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছেন। এই সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কেমন হলে ভালো হয় তা নিয়ে লিখেছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অরবিন্দ পানাগাড়িয়া। মোদী সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন অম্লানকুসুম ঘোষ।

এরই সঙ্গে থাকছে রথযাত্রা নিয়ে আকর্ষণীয় রচনা।

।। দাম ১০.০০ টাকা মাত্র।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

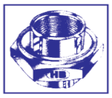
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

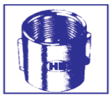
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তৃণমূলী সন্ত্রাস

চৌত্রিশ বৎসরের সন্ত্রাসের কারণে মানুষ পরিবর্তন চাহিয়াছিল। বাম আমলে বামেদের প্রবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়াছিল। কিন্তু পরিবর্তন হইলেও সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই। পরিবর্তনে সরকার বদল হইয়াছে। একটি দলের পরিবর্তনে অন্য দলের সরকার গঠন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু মানুষের উদ্দেশ্য সাধন হয় নাই। এই পরিবর্তনই কি মানুষ চাহিয়াছিল? আজ সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী অত্যাচারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উত্তরসূরি হইয়া উঠিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকার পরিবর্তন হইলেও শাসক শ্রেণীর অত্যাচার এখনও বন্ধ হয় নাই। কেবল পতাকার রঙ বদল হইয়াছে মাত্র। বামপন্থী গুণ্ডারাজ আজ তৃণমূলী লুম্পেনের দলে রূপান্তরিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভণ্ডামির মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে। বিগত দিনে তাঁহার যে সৌজন্য মানবিকতা মানুষ দেখিয়াছিল তাহা বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। এখন তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতোই উদ্ধত ও অহঙ্কারের প্রতীক। রুচিশীল সংস্কৃতিমান মানসিকতা তাঁহার অভিধানে বর্তমানে অদৃশ্য। নিতান্তই মস্তিষ্কবিকৃত না হইলে বিপক্ষের নেতাকে ‘তুই-তোকারি’ করা বা ‘হরিদাস’ আখ্যা দেওয়া অথবা ‘কোমরে দড়ি দিয়া’ জেলে ঢুকাইবার আস্ফালন কেহ করিতে পারে না। উন্নয়নের হরিনাম অহরহ পাঠ করিলেও তিন বৎসরে রাজ্যের কোনো উন্নয়ন হইল না কেন এই বিষয়ে কোনো সদুত্তর নাই। স্কুল কলেজের পরিকাঠামোতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। সেখানে নিত্য হাঙ্গামা চলিতেছে। বিদ্যায়তনে দেবী সরস্বতীর পরিবর্তে তৃণমূলী লুম্পেনরা বিদ্যমান। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থাও তথৈবচ। সর্বক্ষেত্রেই দায় না লইয়া দোষ এড়াইবার চেষ্টা। এতদিন সততার বুলি কপচাইলেও সারদার কলঙ্কের দাগ তাঁহার অঙ্গেও ধীরে ধীরে লাগিয়া যাইতেছে। তাঁহার দলের নেতারাই বলিতেছেন সারদা হইতে বেশি সুবিধা লইয়াছেন মমতা। সারদার চ্যানেল ও সংবাদমাধ্যমগুলিতে তৃণমূলী বাজনা বাজিত কিসের জন্য। জনসমর্থন কমিতে আরম্ভ করিলে আসল স্বরূপ বাহির হইয়া থাকে। মমতার ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। এখন ক্ষমতা বাঁচাইবার জন্য পূর্ববর্তী শাসকের মতো সন্ত্রাসকেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন তিনি। তাঁহার দলের বিধায়কও সন্ত্রাসের শিকার হইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন— ‘আমার নিজের অবস্থা এমন হইলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হইতেছে!’ বিজেপিকে এতদিন সংখ্যালঘু বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িক বলিলেও রাজ্যে এখন সংখ্যালঘু মুসলমানদেরও খুন করা হইতেছে। কাহারা প্রকৃত সাম্প্রদায়িক তাহা এখন বুঝিবার সময় আসিয়াছে। বস্তুত বিজেপি-কে ঠেকাইতে এক অভিনব কৌশল লওয়া হইয়াছে— হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে সংখ্যালঘু তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের দিয়া বিজেপি কর্মীদের ঘরে লুঠপাট, ভাঙচুর, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি চলিতেছে, অন্য দিকে যে অঞ্চলে খোদ সংখ্যালঘুরাই বিজেপি'র সমর্থক সেখানে তাঁহাদের খুন করা হইতেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাইবার এই কৌশল কি সার্থক হইবে? কেন্দ্রের মোদী সরকারকে বেকায়দায় ফেলা এবং তাঁদের দলের বদনাম করিবার লক্ষ্যে তৃণমূল বাংলায় দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিতে হইবে বিজেপি দাঙ্গা লাগায় না, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরিয়া দাঙ্গা লাগাইবার চেষ্টা চালাইতেছে তৃণমূল। কিন্তু এইভাবে সন্ত্রাস করিয়া সংগঠিত দল সিপিএম রাজ্য হইতে মুছিয়া গিয়াছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল তৃণমূলেরও মুছিয়া যাইতে সময় লাগিবে না। ‘মিশন ২০১৬’ সেই ইঙ্গিতই দিতেছে।

সুভাষিত

মূর্খস্য পঞ্চচিহ্নানি গর্ব দুর্বচনং তথা।

ক্রোধশ্চ হটবাদশ্চ পরবাক্যেষ্বনাদরঃ।।

মুর্খের পাঁচটি লক্ষণ—গর্ব, অপশব্দ প্রয়োগ, ক্রোধ, হঠকারিতা ও অন্যের কথায় তাচ্ছিল্যভাব।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘের আন্দোলনে বিপুল সাফল্য কেরলে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় দু'বছর আগে কেরলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোল ঘেঁষে উর্বর কৃষিজমিতে ঘেরা আরানমুলা অঞ্চলে বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত যখন প্রায় পাকা হয়ে গেছে তখনই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক কুমানাম রাজশেখরন গ্রামবাসীদের নিয়ে বিমানবন্দর বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে রাজশেখরনের এই বিক্ষোভকে মুখ্যমন্ত্রী ওমানচণ্ডী সেদিন তাচ্ছিল্য করেছিলেন।

দু'বছর না ঘুরতেই চাকা কিন্তু ঘুরে গেল। জাতীয় গ্রীন ট্রাইবুনালের 'চেন্নাই বেঞ্চ' বিমানবন্দর সংস্থার পরিবেশগত ছাড়পত্র খারিজ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত ট্রাইবুনাল সরকারি সংস্থার দেওয়া পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রে নানান অসঙ্গতির উল্লেখ করেছে। যেমন, একরের পর একর চাষযোগ্য জমি ও ছোট জলাশয় এক লপ্তে লেভেলিং করে ফেললে তা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে।

শুধু তাই নয়, এই পরিবেশ সংক্রান্ত সবুজ সঙ্কেত জোটাতে সরকারের দপ্তরগুলি যে সংস্থার দেওয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেছিল আদতে তাদের সেই পরিবেশ দূষণ ঘটিত কাজ করার কোনো যোগ্যতাই নেই। অথচ অযাচিতভাবে কেরল সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর সমস্ত দিক বিবেচনা না করেই তড়িঘড়ি পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক এই ছাড়পত্র দেওয়ায় আদালত তা নাকচ করেছে।

উল্লেখ্য, আরানমুলার গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে সরকারের বিপক্ষে লড়াই করে এই জয় পাওয়ায় খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি কেরলের সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষে দীর্ঘ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এই জয় নৈতিক প্রেরণারও সঞ্চার করেছে।

কেরলের ক্ষেত্রে এমন সব আন্দোলন অর্জিত জয় অতীতে সত্তর-আশির দশকে বামপন্থীদেরই একচেটিয়া তালিকার মধ্যে ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এমন সাফল্য কেরলের বুকে বামেদের সরিয়ে জাতীয়তাবাদীদের সশব্দ আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

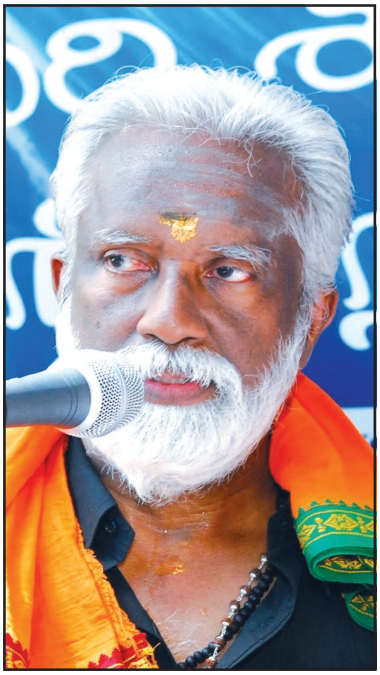

আন্দোলনের রূপকার কুমানাম রাজশেখরন।

স্মরণে থাকতে পারে এর আগে কেরলে ১৯৭৩ সালে হাইডেল বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ২০০০ সালের কোকোকোলা-বিরোধী আন্দোলনের পর এটিই সব থেকে বড় মাপের সরকার বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন। আগের দু'টি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ছিল সিপিএম অধিকৃত কেরল 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' (কেরালা ফোরাম ফর সায়েন্স লিটারেচার)। কিন্তু তারা যে আজ ক্রমক্ষয়িষ্ণু শক্তি সেটিই প্রমাণিত হলো সঙ্ঘ পরিবারের নেতৃত্বে অর্জিত এই জয়ে। পরিষদের সভাপতি শশীধরন পিল্লাই জানান, ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০০ একর জমির ওপর এটিই হতে চলেছিল দেশের প্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন 'সবুজ বিমান বন্দর'। মজার ব্যাপার এই বিমান বন্দর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তৎকালীন বাম মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন। এর ফলেই মার্ক্সবাদী নিয়ন্ত্রিত পরিষদের আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়। আরামুলা জেলায় দু হাজার একর জমি অধিগ্রহণের নোটিস জারি করে বিমান বন্দর তৈরি করার পথ সুগম করার এই সিদ্ধান্তকে পরবর্তীকালে বামপন্থীরা আত্মঘাতী বলেই মনে করেন। ২০১১ সালে তাঁরা ক্ষমতা হারান।

এই প্রসঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক ভাষ্যকার ভাল্লিকুনুর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, বামপন্থী দল হতে গেলে কতকগুলি মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যেমন সমাজবাদী চিন্তা ভাবনায় অগ্রাধিকার পাবে পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনা। কার্লমার্ক্সকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, বিশ্বের পরিবেশ সংক্রান্ত বিপদের সমাধানে শুরুতেই একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও জীববিদ্যা সংশ্লিষ্ট সংস্কারে হাত দিতে হবে। এটা তখনই করা সম্ভব যখন একটি দেশের মধ্যে সর্বহারার বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেশকাল নিরপেক্ষভাবে এসব আকাশ কুসুম কল্পনা করে তাত্ত্বিক ঢেঁকুর তুলতে গিয়ে আজ বামপন্থীদের আম ও ছালা দু'টোই যেতে বসেছে। তবে বামপন্থী তাত্ত্বিকের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো--- বামপন্থীরা এখন গ্লোবালাইজেশনের স্বপক্ষে গলা ফাটায় অথচ তাদের মধ্যে নীচু তলায় সর্বহারার সঙ্গে কাজ করে উঠে আসা কোনো নেতাই নেই।

সঙ্ঘের এই যুগান্তকারী জয়ে কেরলের বাম ও শাসক কংগ্রেস উভয়ের মধ্যেই চাঞ্চল্য

দেখা দিয়েছে। বামপন্থী নিয়ন্ত্রিত পরিষদ কর্তা পিল্লাই বলছেন, সঙ্ঘ পরিবেশের সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগসূত্র ঘটানোর মধ্যে দিয়েই এই সাফল্য পেয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে সঙ্ঘ প্রচারক রাজশেখরন আরানমুলা গ্রামের ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী কাউন্সিলের একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। তিনি আন্দোলনের সময় মূল স্লোগানটি তুলেছিলেন— ''কোনো একটি অঞ্চলের ঐতিহ্য সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।'' গ্রামবাসীদের তিনি

একজন অত্যন্ত চৌকস ও নির্ভীক স্বয়ংসেবক রাজাশেখরনকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। সাংবাদিকতায় স্নাতক রাজশেখরন প্রথমে এফসিআই-তে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮০ সালে বিখ্যাত সবরীমালা মন্দির যাওয়ার পক্ষে নিলাক্কলে একটি প্রস্তাবিত গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম আন্দোলন সঙ্ঘটিত করেন। সমস্ত খৃস্টানি কৌশল ব্যর্থ করে তিনি গীর্জার নির্মাণ স্থগিত করে দেন। এর চার বছর পরে

সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর পরিকল্পনা ও প্রয়োজনে আন্দোলনে নামা সঙ্ঘের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। এই পশ্চিমঘাট সংরক্ষণ আন্দোলনের নাম শুনেই নড়ে চড়ে বসছেন চার্চ কর্তারা। এর পাদদেশেই বাসকরা মানুষদের গরিব বানিয়ে রেখে সাহায্যের টোপ খাইয়ে ধর্মান্তর করানই তাঁদের ব্যবস্থা। ধর্মান্তরের সাফল্যেই আসে টাকা। সিপিএম, কংগ্রেসের ঝুলিতে ঢোকে ভোট। তাই দু'দলই

আন্দোলনে স্থানীয় অধিবাসীরা।

স্মরণ করাতে ভোলেননি যে আরানমুলা গ্রামটি আদতে 'রাষ্ট্র সঙ্ঘ অনুমোদিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্য বহনকারী গ্রাম'। সেখানে একটি বিশেষ ধাতু ও এ্যালয় মিশিয়ে যে হাতে তৈরি আয়না তৈরি হয় তা বিশ্বে বিরল। এই দু'টি বিষয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করতেই দলে দলে মানুষ সঙ্ঘ পরিচালিত এই সদর্থক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে কাঠখড় তাঁকে কম পোড়াতে হয়নি। এসেছে প্রবল বাধা। ২০১২ সালে শুরুর সময় স্থানীয় এম এল এ, এমপি ও রাজ্য সরকার সকলেই ছিল বৈরী। সকলেই প্রকল্পের পক্ষে। প্রমোটারও কয়েকটা আইনগত ছাড়পত্র জুটিয়ে নিয়েছিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই সঙ্ঘের তরফে তিনি নির্দ্ধিধায় তাঁর সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে যোগ দেন। এই পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের সাফল্য বহুমুখী ও বিপুল সম্ভাবনাময়। কেননা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আরানমুলার গ্রামবাসীরা বা পরিবেশকর্মীরা বা সিপিএম, সিপিআই সমর্থকরাই নয় চার্চ, কংগ্রেস সহ নানান মুসলমান সংগঠন ও কট্টরপন্থী বামেরাও সামিল হয়েছিলেন।

আরানমুলার এই চমকপ্রদ গণ আন্দোলন সঙ্ঘের কার্যধারায় যে বিপুল অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবে তা অনস্বীকার্য। ইতিমধ্যেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সংরক্ষণে 'মাধব গ্যাডগিল কমিটি'র সুপারিশগুলি কার্যকর করতে ঘাবড়াচ্ছে যদি পশ্চিমঘাট জঙ্গলের পাদদেশে থাকা চাষিদের স্থানান্তরিত হতে হয়। এই আগাম আতঙ্কেই ভোট-অন্তপ্রাণ কংগ্রেস সরকার গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশ আটকাতে কেন্দ্রের কাছ থেকে 'কস্তুরীরঙ্গম প্যানেল' নামে একটি কুমতলবি কমিটি আমদানি করেছে। তবে বিশাল সাফল্যে বলীয়ান সঙ্ঘের জাতীয় কর্মসমিতি কোচীতে হওয়া গত অক্টোবরের বৈঠকে তাঁদের লক্ষ থেকে এক চুলও না নড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। এক প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন, গ্যাডগিল কমিটির সুপারিশগুলি সবই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী, তাই এক্ষেত্রে কোনো আপোস করার প্রশ্নই নেই।

সংবাদ প্রতিবেদন

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথা বহির্ভূতভাবে আর এস এসের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল আশ্রিত রাজনৈতিক দুষ্কৃতীরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার ভাঙ্গড়, ক্যানিং, জীবনতলা, দোসা, সুদিয়া, মাধবপুরের হিন্দু সংগঠনগুলো আক্রান্ত হচ্ছে। ভাঙ্গর নিবাসী আর এস এসের সোনারপুর মহকুমা কার্যবাহ তপন পাল-কে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদে বারুইপুর রাসমাঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। গত ৮ মে রবিবার দুপুর ২.৩০ টায় এই সভায় প্রচণ্ড রৌদ্র উপেক্ষা করে প্রায় ৫০০০ স্বয়ংসেবক উপস্থিত হয়। সভায় সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, বিজেপি-র অধ্যাপক তথাগত রায়, ডাঃ সুভাষ সরকার, ডঃ স্বরূপ ঘোষ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দিলীপ ঘোষ, স্বরূপ দত্ত, সুদীপ ঘোষ, মৃগাঙ্ক রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন সঙ্ঘের বারুইপুর নগর সঙ্ঘচালক ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা কার্যবাহ স্বপন সাহা। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সুদীপ ঘোষ ও জেলা কার্যবাহ মৃগাঙ্ক রায়ও বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আই বি রিপোর্ট

বিদেশী মদতপুষ্ট এনজিওগুলি উন্নয়নকে স্তব্ধ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যসূচির দ্রুত রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনটিলিজেন্স ব্যুরো (আই বি) একটি ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্ট পেশ করেছে। যেখানে কয়েকটি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও-কে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

ইউএসএ, ইউকে, জার্মানি, নেদারল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মদতপুষ্ট বেশ কিছু এনজিও দেশের মানুষকে কাজে লাগিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছে যা উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজকর্মকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও) পেশ করা তথ্যে আই বি বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছে। গত ৩ জুন পেশ করা ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, হিসেবে দেখা যাচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি বৃদ্ধিতে বার্ষিক ২ বা ৩ শতাংশ হারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সাতটি সেক্টর বা প্রোজেক্ট চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি এনজিও পরিচালিত আন্দোলনের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। সেক্টর বা প্রোজেক্টগুলি হলো— নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টস, ইউরেনিয়াম মাইনস কোল-ফায়ারড পাওয়ার প্ল্যান্টস, ফার্ম বায়োটেকনোলজি, মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টস, হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্টস এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ। একুশ পৃষ্ঠার ওই রিপোর্টে এনজিওগুলির ২০১১-১৩ সালের উন্নয়ন বিরোধী কাজের বিশদ বর্ণনা দিয়ে ২০১৪ সালে তাদের ষড়যন্ত্রের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রেগুলি কীভাবে এনজিওগুলি চাপ সৃষ্টি করবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, ইন্দোনেশিয়া থেকে পাম অয়েল আমদানি ও ভারতের আই টি ফার্মগুলির ই-বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাষণ বিরোধী আন্দোলন, শহরাঞ্চলের নির্মাণ শিল্পের কর্মীদের সংগঠন, গুজরাটের স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়নস, পারতাপি নর্মদা রিভার ইন্টারলিংকিং প্রোজেক্ট এবং দিল্লী- মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরির বিরুদ্ধে জনতাকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন করবে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য প্রথমে জাতপাতভিত্তিক, মানবাধিকার বা বিশাল বাঁধ নির্মাণের মতো বিষয়গুলিকে ঠিক করা হয়েছিল। এখন তা পরিবর্তন করে উৎপাদন-বৃদ্ধি বিরোধিতার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

মোদী সরকারের প্রথম পদক্ষেপ গঙ্গা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের প্রাণস্বরূপ গঙ্গানদীর সংস্কার নরেন্দ্র মোদীর প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল। ক্ষমতায় বসেই তাই প্রধানমন্ত্রী জলপথ পরিবহণ ও পর্যটনকে মাথায় রেখে গঙ্গা সংস্কার রূপায়ণে মনোযোগী হলেন। গত ৬ জুন তিনি ঘোষণা করেছেন বারাণসী থেকে হুগলী পর্যন্ত গঙ্গার নাব্যতা বাড়িয়ে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে পাটনা সহ ১১টি ঘাট সংস্কার করা হবে।

এসবের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত ১৬০০ কিলোমিটার জলপথ সংস্কার করার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।

এসব পরিকল্পনা ৬ জুন জাহাজমন্ত্রী নীতিন গডকরীর নেতৃত্বে চারমন্ত্রকের মন্ত্রী--- উমাভারতী, প্রকাশ জাভড়েকর ও শ্রীপদ নায়েকের এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জল সেক্রেটারি অশোক রাওয়াতের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটি প্রধানমন্ত্রীর গঙ্গা উন্নয়ন মন্ত্রকে পরিকল্পনার খসড়া পাঠিয়ে দিয়েছে। কমিটি আগামী মাসে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গঙ্গা পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার খসড়াও পেশ করবে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, শুরুতে ৪৫ মিটার চওড়া ও ৩ মিটার গভীরে গঙ্গাবক্ষে ড্রেজিং হবে। যাতে করে বারাণসী থেকে হুগলী পর্যন্ত যাত্রী ও মাল পরিবহণের উপযোগী হয়। প্রতি ১০০ কিলোমিটার অন্তর বাঁধ তৈরির একটা পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। এতে জলের গতি ও বন্যা রোধ করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাহাজ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরী বলেন, দুই বাঁধের মধ্যবর্তী জলস্তর এমন রাখা হবে যাতে মাছ চাষের উপযোগী হয়। তাতে লোকের কর্মসংস্থান হবে। গডকরী আরো বলেন, মানব সম্পদ মন্ত্রকের আওতায় রুরকীতে ‘গঙ্গা রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ তৈরি করা হবে এবং পর্যটন মন্ত্রক গঙ্গার পাড়ে পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মূলত গঙ্গানদী সংস্কার ধর্মীয় পর্যটনের দৃষ্টিতেই করা হবে।

গ্রামবাংলার বহু মুসলমান যোগ দিচ্ছে বিজেপি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র ১৭.৫ শতাংশ ভোট পাওয়া সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করেছিল। ২০০৯-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল মাত্র ৬.১৪ শতাংশ। সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আরও একটি আশ্চর্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সারা রাজ্য জুড়ে বিশেষত যেখানে দল এবার ভোটের হার অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে, ফল স্বরূপ বহু সংখ্যায় মুসলমান বিজেপি-তে আসছে।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে এবং রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এইসব এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম শত শত মুসলমান পরিবার বিজেপি আয়োজিত ‘যোগদান’ উৎসবে এসে নিজেদের নাম লেখাচ্ছে। সেই নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন থেকে এটা প্রায় রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের যোগদানের সংখ্যাটা কত তা নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও স্থানীয় বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধু জলপাইগুড়ি জেলাতেই ৪০ হাজারের বেশি হবে। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই সক্রিয়তার পেছনে কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণকে চিহ্নিত না করা গেলেও তা কয়েকটি কারণের মিশ্রণ বলা যেতে পারে। যেমন— রাজনৈতিক আস্থা, নির্বাচনের ফলাফলে সৃষ্ট উৎসাহ এবং স্থানীয় বাম নেতাদের ভীতিপ্রদর্শন ও অত্যাচার। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের স্লোগান। উন্নয়ন মানে কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য।

‘যোগদান’ অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতারা যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের একটি শপথ বাক্য পাঠ করান যাতে বলা হয়েছে— ‘আমি সম্পূর্ণভাবে ও আন্তরিকভাবে ঘোষণা করছি যে আমি একজন জাতীয়তাবাদী। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত। আমি ভারতীয় সংবিধান মেনে চলবো।’

সিপিএম নেতারা মোদী-জুজু-র ভয় দেখালেও তারা জানিয়েছে —গুজরাটে কি ঘটেছে তারা তা জানে এবং সেটা ১২ বছর আগের ঘটনা। মোদী একবারও কোনো মুসলমান-বিরোধী কথা বলেননি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার বক্তব্য— “এসব মানুষ সব ধরনের সুযোগ খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের অনুভব হলো হয় তারা ঠকেছে নয়তো শোষিত হয়েছে। তারা এখন নতুন সুযোগের আশায় বিজেপি-তে যোগ দিতে চাইছে। তাদের আশা, নতুন সরকারের কাছে তারা ভালো ব্যবহার পাবে। আমরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছি।”

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা যতদিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ-এরই বর্তমান রূপ ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিবর্তনের রূপরেখা এই সংখ্যার স্বস্তিকায় তুলে ধরা হবে। এরই পাশাপাশি থাকছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলির পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টাকে নিয়ে উদাসীনতা— এককথায় যা লজ্জাজনক। লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশিত হবে ৭ জুলাই ২০১৪।। দাম দশ টাকা।।

সত্বর কপি বুক করুন।।

রাজ্যের জনমত দ্রুত বিজেপি-র পক্ষে যাচ্ছে

তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডেড সাংসদ জেলবন্দি কুণাল ঘোষ গোপনে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাছে ৯১ পাতার একটি চিঠি পাঠিয়ে সারদা চিট ফান্ড থেকে তৃণমূলের কোন কোন নেতারা লাভবান হয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কুণালবাবুর চিঠিটি এখন সিবিআইয়ের হাতে। এই চিঠিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, 'দিদির একটা অন্ধকার দিক আছে। দু' চার জন খুব কাছের লোক ছাড়া তৃণমূলের নেতাদেরও তা জানা নেই। তাঁর ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষায় তিনি যে কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণা হতে পারেন রাজ্যের মানুষ জানেন না।' কুণালবাবুর কথাটা খুবই সত্যি। গত লোকসভার নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি আসনের ৩৪টি দখল করেও তৃণমূল নেত্রী মোটেই খুশি নন। তার কারণ, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র রাজনৈতিক উত্থান। লোকসভায় বিজেপি-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়তে হবে প্রধান প্রতিপক্ষ জাতীয় দল বিজেপি-র সঙ্গে। যে কোনও ছোট আঞ্চলিক দলের পক্ষে একটি সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটা কঠিন কাজ। লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভোট বেড়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ। বিজেপি-র প্রতি এই বিপুল জন-সমর্থনের জন্যই রাজ্যে মুছে গেছে বামপন্থী দলগুলি। ক্ষতিগ্রস্ত কংগ্রেস দলও। এর থেকে একটা বার্তা স্পষ্ট যে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাজনৈতিক মেরুকরণ দ্রুত হচ্ছে। গত ২০১১ সালে এই রাজ্যে সিপিএম এবং সিপিএম বিরোধী অর্থাৎ বাম ও অ-বাম মেরুকরণের জেরেই বিধানসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এখন বামপন্থী দলগুলির মৃত্যু ঘটায় নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়েছে। লোকসভার গত নির্বাচনে রাজ্যের ৩৭টি আসনে বামদলগুলির প্রাপ্ত ভোট এবং বিজেপি-র ভোট যোগ করলে দেখা যাবে যে তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি আসন ছাড়া সর্বত্র হেরেছে। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের মোট ভোটদাতাদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন। অথবা বলা যায় পেশিশক্তির আস্ফালনে প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা জোড়া ফুলে বোতাম টিপতে বাধ্য হয়েছেন। কেন্দ্রে শক্তিশালী স্থায়ী সরকার গড়ার পর বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

গূঢ়পুরুষের ■ কলম

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের খুন ধর্ষণের রাজনীতি বরদাস্ত করবেন না। কুণাল ঘোষ তাঁর সর্বশেষ গোপন চিঠিতে মন্তব্য করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতায় ও অসৌজন্য দেখানোয় বিশ্বাস করেন। কথাটা সত্যি। মাননীয় নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বা তাঁর সরকার প্রোটোকল মেনে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়নি। মোদী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যত বয়কট করেছেন। এর থেকে বড় অসৌজন্য আর কী হতে পারে! মমতা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে তিনি এবং তাঁর সরকার কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে রাজনৈতিক শত্রু বলে মনে করে। আমি জানি না যে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বার্তা সঠিকভাবে পড়তে পেরেছেন কীনা। যদি পড়তে পেরে থাকেন তবে মমতাকে তোয়াজ করতে বিশেষ আর্থিক সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার নীতি তাঁদের বর্জন করতে হবে। মমতাকে আলাদা প্যাকেজ দিলে অন্য রাজ্যগুলি মনে করতে পারে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। মমতা মুখে যাই বলুন না কেন রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। আই পি এল ক্রিকেট উৎসব, টেলি সিরিয়াল উৎসব, মাটি উৎসব ইত্যাদিতে রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে, অর্থের অভাব থাকলে এমন নবাবি করা যেত কি? দেশের অন্য কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতার মতো এমন লাটসাহেবি উৎসব করতে পারেন না। মমতা নাকি অতি সাধারণ জীবনযাত্রা পছন্দ করেন। তাঁর জীবনযাত্রাটা যে কত সাধারণ আটপৌরে এবার উত্তরবঙ্গ সফরের সময় সরকারি আমলারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। মমতার রাত্রিবাসের জন্য জয়ন্তীর সুসজ্জিত বনবাংলো প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাঁর ঘরের রুম ফ্রেশনারের গন্ধ পছন্দ না হওয়ায় তিনি বাংলো বাতিল করে জলদাপাড়া চলে যান। সেখানে রাত্রিবাসের সময় মিনিট পনেরো লোডশেডিং হওয়ায় অতি সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে সেখানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিভিশনাল ম্যানেজারকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন। হ্যাঁ, এটাই দিদির সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাত্রার নমুনা।

মমতা ব্যক্তিগতভাবে অতি প্রতিহিংসাপরায়ণা। বামদলের এবং সাইনবোর্ড সর্বস্ব কংগ্রেস দলের সমর্থক কর্মীরা লাখে লাখে রোজই বিজেপির পতাকার তলায় আশ্রয় নিচ্ছেন। এই জনজোয়ার রুখতে তৃণমূলের আশ্রিত গুণ্ডা সমাজবিরোধীরা খুনের রাজনীতি চালু করেছে। বিজেপি সমর্থকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। থানা পুলিশ করে প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এটাই আশা ও ভরসার কথা। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোটা প্রকৃত জনসেবা। তবে তৃণমূলের হিংস্রতাকে রুখতে একই সঙ্গে আক্রান্ত পরিবারদের আইনি সহায়তাও দিতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশ ও প্রশাসনের স্তাবক আমলাদের আদালতে টেনে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখা দরকার যে এই রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মিডিয়ারও পরিবর্তন হচ্ছে। খবরের কাগজে এখন বিজেপি-র উপর বর্বর আক্রমণের ঘটনা প্রথম পাতায় বড় করে ছাপা হচ্ছে। গত ৫০ বছরে মিডিয়ার এমন সমর্থন দেখিনি। রাজ্যের জনমত বিজেপি-র পক্ষে যাচ্ছে বলেই মিডিয়া আর বিজেপিকে অচ্ছুৎ রাখতে পারছে না।

রসে থাকলেই বসে থাকবে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

কবে যে শীত পড়বে কে জানে! আমার সত্যিই আর ভাল লাগছে না। দিদি, শীত পড়লে বেশ একের পর এক উৎসব করা যাবে। এই মেলা, সেই মেলা বেশ জমে থাকে সময়টা। সবাই বলবে বর্ষাই এল না ঠিক করে এখন থেকে শীত শীত করে বায়না ধরতে নেই। কিন্তু আমি জানি দিদি, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। আপনিও জানেন রসে বসে থাকাই তো আসল থাকা। মেলা মানে শিল্প। আর শিল্প মানে উন্নয়ন।

তবে দিদি আপনার অবশ্য মেলা করার জন্য ঋতুর পথ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। ঋতুর মৃত্যু কিংবা কেকেআরের জয় সবকেই আপনি উৎসব করে দিতে পারেন অনায়াসে। সত্যি দিদি, আপনার প্রতি এই বাংলার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বাজারে চড়া দাম, রাস্তায় কড়া রদ্দুর এসবের মধ্যেও গোটা বাঙালি জাতটাকে আপনি নাচিয়ে দিলেন। নাচ মানে নাচ! এ একেবারে উদ্দাম নৃত্য।

এবার ভোটে আপনার বেশ খাটাখাটনিই গেছে। অনুব্রতদের সামলানো, দীপালিদের লুকিয়ে রাখা সব এক হাতে করতে হয়েছে। একা কুম্ভের মতো গোটা রাজ্যে প্রচার চালানো, নরেন্দ্র মোদীকে গাল দেওয়া সব একা হাতে। এরই মধ্যে শুভেন্দু, শিশিরদের ম্যান মার্কিংয়ে রাখতে হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে আটকে রাখতে না পারলেই বাপ-ব্যাটায় আবার যখন তখন পেনাল্টি বক্সে চলে আসতে পারে। যাই হোক সব সামলে বিশাল রেজাল্ট করার পরই যোগ্য মুগুর দিয়ে দিয়েছেন।

শুধু কি অধিকারীদের নাকি? ব্রাত্যকে সরিয়ে, পার্থকে তুলে, মুকুলকে তোল্লা দিয়ে, অভিষেককে এগিয়ে রীতিমতো দাবা খেলতে হয়েছে আপনাকে। ভোট মিটলেও একটুও সুখ পাননি। হ্যাঁ দিদি ঠিকই করেছেন। এখন বিরোধীদের থেকে বেশি দলের ভিতরে দাবা খেলাটা বেশি জরুরি। লোকসভা ভোটের রেজাল্টে যে যতই লাফাক আপনি ভালই জানেন এটা প্রদীপের দপ করে জ্বলে ওঠা। প্রদীপের তলায় তলায় অনেক আঁধার জমে আছে। এখন থেকেই সেসব মেরামতি করতে শুরু করে ভাল করেছেন। পারবেন কিনা কে জানে? একদিনেই আপনার ভাইগুলো এক একটা যা হয়েছে না!

যাগ্গে যা বলছিলাম। ভোট এবং দল সামলানোর পর একটু চেঞ্জে যাওয়া দরকার ছিল। সেই সঙ্গে একটু মুড বদলও দরকার ছিল। কেউ না জানুক আমি জানি দিদি, এবার উত্তরবঙ্গ সফরটা আসলে ছিল আপনার গ্রীষ্মাবকাশ। কদিন একটু গরম থেকে রেহাই। কিন্তু তার মধ্যেই একটা কোম্পানি আপনাকে নতুন বিনোদনের সুযোগ করে দিল। কোম্পানিটার নাম রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট। মূলত এই সংস্থাটি সিনেমা বানালেও এদেরই আবার একটা আই পি এলের ক্রিকেট দল আছে। যার নাম কলকাতা নাইট রাইডার্স। মালিক শাহরুখ খান, জুহি চাওলা। কলকাতা নাস্তা বিস্কুটের সঙ্গে যেমন কলকাতার কোনও যোগ নেই তেমনি কেকেআরের সঙ্গেও কলকাতার কোনওই সম্পর্ক নেই। তবু আপনি যেভাবে দলটাকে এক করে নিলেন তাতে আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতেই হয়। সে আপনার বিমান ভাড়া, ওদের জন্য গিফট, মাঠ ভাড়া ইত্যাদি ইত্যাদিতে কোটি খানেক টাকা খরচ হয়েছে তো কী হয়েছে? এমন একটা উৎসবের উপলক্ষ্য তো পাওয়া গেল। এটাকেই তো বড় করে দেখা উচিত। গতবার ছিল কপালে এবার না হয় হাতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে এক সুপারস্টারের চুমু (পড়ুন কিস) খাওয়ার ছবি তো উঠল।

কিছু অসভ্য লোক কিছু অবান্তর প্রশ্ন তুলেছে। তাবলে আপনি দমবেন না দিদি। এবার বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে উৎসেবর আয়োজন করুন। ভাই মদন মিত্রকে বলুন রাজ্যটাকে ফুটবলে চুবিয়ে রাখতে। এরপর দেখতে দেখতে পুজো এসে যাবে। গণেশ পুজো থেকে বিশ্বকর্মা, দুর্গা, কার্তিক হয়ে একেবারে সরস্বতীতে গিয়ে শেষ হবে। এরপর বইমেলা, মাটি মেলা এটা সেটা কত কী! মাঝে মাঝে টলিউড এবং আপনার ভাষায় টলিউডের নট নটীদের নিয়ে কিছু একটা নাম দিয়ে উৎসব করলেই হয়। নাম দেওয়ার ব্যাপারে তো আপনার জুড়ি নেই। বছরে বার কয়েক বঙ্গশ্রী, বঙ্গভূষণ দেওয়ার মেলাও করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আপনি দেখা করতে জাননি বেশ করেছেন। ওসব দিয়ে উৎসব হয় না। উন্নয়ন আর উৎসব এক সঙ্গে হয় না। ঠিকই করেছেন। সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার কিংবা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপীনাথ মুণ্ডেকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জাননি বেশ করেছেন। কারণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, সুচিত্রা সেনদের মরদেহ নিয়ে মিছিলকে উৎসবে পরিণত করার ম্যাজিক আপনি জানেন। বিজেপি নেতাদের মৃত্যুটা বড্ড শোকের। ওসবে কোনও আমোদ নেই।

সুতরাং কেকেআর জিন্দাবাদ। কর্মহীন যুবকদের খ্যাপাবেন না। ওরা রসে থাকলেই বসে থাকবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

ভারত কি আগামীদিনে সত্যিই কংগ্রেসমুক্ত হতে চলেছে?

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীতে নরেন্দ্রভাই মোদীর অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই ৩০ বছর পর কোনো দল এককভাবে দেশের শাসন ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিমে কংগ্রেস দলের পক্ষে ব্যাপক দুরবস্থা প্রকটিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি আঞ্চলিক দলের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। আজকের দিনে তেলেঙ্গানা ও সীমান্ধ্র নিয়ে দেশে মোট ২৯টি রাজ্য। এর মধ্যে ৬টি বড় রাজ্য ও গোয়া সমেত ৭টিতে বিজেপি শাসন ক্ষমতায়। ভোটের আগে থেকেই ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, দিল্লী নানান রাজনৈতিক অস্থিরতায় কবলিত। যেমন উত্তরাখণ্ডের প্রভাবশালী নেতা শতপাল মহারাজ যে কোনো দিন তাঁর দলবল নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দেবেন। লোকসভা ভোটের আগেই তিনি এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। আবার উত্তরাখণ্ডের ৫টি লোকসভা আসনেই বিজেপি ৫-০ আসনে জেতায় সেখানে কোনোক্রমে টিকে থাকা কংগ্রেস যে কোনোদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। দলবদলের রাজধানী ঝাড়খণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি মানুষ আর কংগ্রেস সংসর্গ চায় না। সেখানকার ১১টির মধ্যে ৯টি আসনই বিজেপি দখল করেছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে জগাখিচুড়ি জোট সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পরিণতিতে ক্ষমতাসীন হবে অন্য জোটসঙ্গী-সহ বিজেপি বা সেখানে নতুন নির্বাচন হতেও পারে। দিল্লীর ২০১৩ সালের শেষ লগ্নের রাজ্য নির্বাচনে 'ঝড়ে বক মরা'র মতো যে জনরোষের কিছুটা অংশ নতুন খাবার চেখে দেখার আশায় আপ দলের দিকে ছুটেছিল তারা আর যে 'বেলতলায়' যাবে না তা দিল্লীর লোকসভা ভোটে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এর পরও মেকি টুপি বিলাসী কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ পা বাড়ালেও দিল্লী ভোটে শতাংশের হিসেবে বিজেপি ৫৪ শতাংশ ভোট পাওয়ায় এই ফারাক আপ বা কংগ্রেস দুজনে হাত মেলিয়েও মেটাতে পারবে না। তাছাড়া কংগ্রেসের মতো সর্বাংশে কালিমালিপ্ত দলের সঙ্গে একটি আদ্যন্ত নৈরাজ্যবাদী আপ দলের কোনো কাল্পনিক জোটকে রাজধানীবাসী যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তা চোখ বুজে বাজি ধরা যায়। ইতিমধ্যে দিল্লীতে মোদীজীর সুশাসন প্রত্যক্ষ করার পর তেমন সম্ভাবনা কেবলমাত্র উন্মাদের সিলেবাসেই থাকবে। রাজধানী যে রাজ্য বিজেপি-র হাতেই ন্যস্ত হবে এটি সময়ের অপেক্ষা। তাহলে আগের ৭ এর সঙ্গে অনতিবিলম্বে যোগ হবে আরও ৩টি রাজ্য অর্থাৎ মোট ১০টি রাজ্য।

এবছরের শেষের দিকেই মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে অক্টোবর মাসে ভোট। সেখানে কচুকাটা হয়ে গেছে কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের মতো দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী ও মিশ্র সংস্কৃতির বিশাল রাজ্যে কংগ্রেসের প্রাপ্ত লোকসভা আসন চূড়ান্ত অবমাননাকর— মাত্র দুটি আসন। মনে রাখতে হবে পরিবারবাদ রাজনীতির বাহক মুরলী দেওরা-র পুত্র মিলিন্দ দেওরা, পুরনো সাংসদ সুনীল দত্ত-র কন্যা প্রিয়া দত্ত সকলেই পরাজিত।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি-র আসন ২৩টি, শিবসেনা ১৮ এবং অন্য জোটসঙ্গী ১ অর্থাৎ মোট ৪২টি। কংগ্রেস ও এনসিপি মিলে ৬টি। ইতিমধ্যে বিধানসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় লোকসভার তুলনামূলক বেশি সাফল্যের জিগির তুলে শরদ পাওয়ার রাজ্যে বেশি আসন চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানের সরকার লবি তুমুল সক্রিয়। এমন একটা ডামাডোল অবস্থায় সদ্য লোকসভা ভোটে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় ফেরার কথা কংগ্রেসের অতি বড় সমর্থকও ভাবছেন না।

এই সারিতে রয়েছে কংগ্রেসের আর একটি গোহারান হওয়া ঠিকাদারি রাজ্য হরিয়ানা। এখানেই বসে আছেন ভূপিন্দর সিং হুদা। যিনি সোনিয়ার নির্দেশে তাঁর জামাই-এর শুভ কামনায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শাস্তিমূলক বদলি করেছিলেন আই এ এস আধিকারিক অশোক খেমকার-কে। কংগ্রেসের দলিতনেত্রী কুমারী শেলজা পত্রপাঠ হুদার পদত্যাগ দাবি করেছেন। হরিয়ানার ফলাফল ১০-১-এর নিরিখে কংগ্রেস রাজ্যটি হারাবে এমনটা ভাবা অন্যায় হবে না।

অরুণাচল প্রদেশে লোকসভার ফলাফল ১-১ হলেও হিমালয়ের প্রান্তে চীন সীমান্তের এই ছোট্ট অবহেলিত রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় শাসক দলের সঙ্গেই থাকবে। এটি বাস্তব অনুসারী ধারণা। তাহলে হাতে থাকা দশটির সঙ্গে যোগ হবে আরও সম্ভাব্য বড় ছোট মিলিয়ে ৩টি রাজ্য। মোট দাঁড়াল ১৩টি রাজ্য।

এবার নিকট ভবিষ্যতেই নির্বাচন হবে বহু বিতর্কিত ও মোদী ঝড়ে মাটি নেওয়া বিহারে। এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঝড়ের ঝাপটায় সিংহাসনচ্যুত হয়ে নিজের মান বাঁচাবার চেষ্টায় এক অতি দলিতকে সামনে রেখে সোনিয়ার কায়দায় পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। তিনি লোকসভায় আজ দু' আসনের এলেবেলে দল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন তিনি যে জীবদ্দশায় আর দেখতে

যাবেন না এটা ভাবা বাতুলতা নয়। তাঁরই দাপটে রাজ্যপাট খোয়ানো এক সময়ের সৎভাই জেল কয়েদি লালু তাঁকে বিধানসভায় অক্সিজেন দিচ্ছেন। ২০১৫ সালে মোদী সরকারের কর্মবহুল ১ বছর পেরিয়ে যাবে। সেই সময় নির্বাচন হলে লালু-নীতিশের এই অস্তিত্ব বাঁচানোর জোটের ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২৩, রামবিলাস-৬, বিজেপি জোটের আর এল এস পি-৩, কংগ্রেস-২, লালু-৪, আর জে ডি ইউ-২টি আসন পেয়েছে। এই আছাড় সামলে ওটা খুব সহজ হবে না।

পরেই আসছে জম্মু-কাশ্মীর। এখানেও লোকসভায় কাশ্মীরকে জমিদারি ভাবা বাপ-ছেলের দল ন্যাশানাল কনফারেন্স নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইতিম্যধ্যে ধারা ৩৭০, ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ড নিয়ে বিতর্ক ধূমায়িত হচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাটজু অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করেছেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ রামমাধব বিতর্ক উস্কে দিয়ে জানিয়েছেন--- কাশ্মীর আবদুল্লাদের পৈতৃক জায়গির নয়। বিতর্ক আরও গড়িয়ে চলবে।

পাক-প্রধানমন্ত্রী বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়তের সঙ্গে ভারতে এসেও দেখা করেননি। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন শীঘ্র শুরু হবে। শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরবাসী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করে নিজেদের রাজ্যের বিকাশ কিছুতেই থমকে দিতে চাইবে না। এখানে পিডিপি-র সঙ্গে বিজেপি-র জোট সরকারের জয়ের সমূহ সম্ভাবনা। তাহলে ১৩-র সঙ্গে যোগ হবে আরও দু'টি রাজ্য। মোট ১৩+২=১৫টি রাজ্যে বিজেপি-র ক্ষমতাসীন হওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কিছু লক্ষণ অবশ্যই দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে সীমান্ধ্রে টিডিপি-র জোটসঙ্গী হয়ে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এখানে কংগ্রেস কোনো ধর্তব্যের মধ্যে নেই। তারই গড়িমসির ফসল তেলেঙ্গানায় চন্দ্রশেখর রাও কংগ্রেসকে অচ্ছুত করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

এই হিসেব অনুযায়ী কংগ্রেস শাসনহীন রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭টি। প্রসঙ্গত উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৫টি (অরুণাচল আগে ধরা হয়েছে) রাজ্য নিজস্বার্থেই কেন্দ্র নির্ভর থাকে। ১৭+৫=২২টি হলো। বিপ্লবের ম্রিয়মান পিতৃভূমি ত্রিপুরাটি রয়েছে বিপ্লবীদের দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির চিহ্ন হিসেবে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানকার অবস্থা--- মুসলমান ভোট কিনতে গিয়ে ব্যুমেরাং হয়েছে। লোকসভায় ১৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র ৩টি। কট্টর বদরুদ্দিনের মুসলমান দলের হাতে রয়েছে ৪টি আসন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। রাষ্ট্রপতি শাসন বিচিত্র নয়।

এবারে দেখা যাক কংগ্রেস যেখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক সেই পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের কথা। মার্ক্সবাদীদের পরাভূত মহাপীঠ পশ্চিমবঙ্গে দিদি সন্ত্রস্ত। ভোটের নানান বিপজ্জনক হিসেব দেখে একে ফেলে দিচ্ছেন, তাকে তুলে দিচ্ছেন। সত্যিই দিশেহারা। কিন্তু এখানে কংগ্রেস দীর্ঘকালীন জামানত জব্দের দলে। সামনের নানান নির্বাচনে বিজেপি চমৎকার দেখাতে কোমর বাঁধছে। তামিলনাড়ুর আম্মা এই লেখার সময় দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসে তাঁর রাজ্যের হিতার্থে সম্ভবত ইতিবাচক কিছু রফা করছেন। ওড়িশায় নবীন যথার্থ বাপ কা বেটা—নিজ ভাবমূর্তিতে একাই একশ'। তবে তিনি কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে যাবার মতো কূপমণ্ডুক নন। কংগ্রেস সেখানে ফসিলে পরিণত হয়েছে। পড়ে আছে দেশের সর্বাপেক্ষা বড় রাজ্য এবারের 'ম্যাজিক মাউন্টেন' (সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের বিখ্যাত নভেল) উত্তরপ্রদেশ। বিধ্বস্ত বাপ-বেটার সরকার মুসলমানদের নিখরচায় ধর্ষণের বিনিময়ে তোলা তুলতে তুলতে আজ নিজেরাই অতলান্ত গহ্বরের সামনে। ৮০টির মধ্যে ৫টি আসন পেয়েছে। বিজেপি (জোটসহ) ৭৩টি। মোদীজীর কর্ম প্লাবনের তোড়ে সমাজবাদীরা রাজ্য নির্বাচনে অবলুপ্ত হয়ে যাবেন এমন কথা তথ্যাভিজ্ঞ মহলে উঠেছে। হিসেব প্রায় শেষের দিকে— ২২-এর সঙ্গে যোগ হলো আরও ৫টি কংগ্রেসহীন রাজ্য। দোদুল্যমান অসমকে সঙ্গে নিয়ে চুলচেরা গরিষ্ঠতায় শাসনে আছে কেরল এবং সেটিও আরও নানান দলের জোটসঙ্গী হয়ে।

হায়! মোদীজীর ভবিষ্যদ্বাণী করা কংগ্রেসমুক্ত ভারতের কথাটি যে অচিরেই আক্ষরিক অর্থে মোট ২৯-রাজ্যের মধ্যে লোকসভার হিসেবে ১টি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের ওপর এমন শক্তিশেল হয়ে পড়বে তা অনেক ভোট বিশারদই হিসেবে আনতে পারেননি। কিন্তু সাধারণ মানুষ পেরেছে। অনেকের মধ্যেই স্বপ্ন পূরণের একটা চলমান ভাব নজরে পড়ছে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সব রকমের ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারেই বিপুল বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিকাঠামো ও পাওয়ার (এনার্জি) শিল্পের শেয়ারও খুবই উঁচুর দিকে। বাজারের যৌথ সূচকও উর্ধ্বমুখী। সকলেই আশা করছে এক ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তনের। কালোটাকা পুনরুদ্ধারে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি দ্রুত কাজে হাত দিয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে এনডিএ যৌথ অধিবেশন ডাকলে আজ যে কোনো বিল পাশ করাতে পারে। তবু প্রধানমন্ত্রী আরও অনেক দলকেই এনডিএ-তে শামিল করার চেষ্টা করছেন। সংসদের দুই কক্ষে এনডিএ-র সাংসদ সংখ্যা ৪০১ জন। লোকসভায় ৩৩৮ (৩৩৬+২ মনোনীত) এবং রাজ্যসভায় ৬৩। মোট ৫৪৩+২৫০=৭৯৩ এর মধ্যে এনডিএ-র মেজরিটি ৩৯৭। এমনটা গত ৩০ বছরে অদৃষ্টপূর্ব। দেশ কংগ্রেসমুক্ত বংশবাদমুক্ত হওয়ার স্বপ্ন আর অলীক নয়, বাস্তবের দোরগোড়ায়। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ বঃ)

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শুধু দাঙ্গা নয়, হিরোসিমা নাগাসাকি ঘটেছে। চীন, তিব্বত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যও বাদ যায়নি। কিন্তু গুজরাটে ২০০২-এর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো এক ব্যক্তিকে এতদিন এমনভাবে হেনস্থা করার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গঠিত বিশেষ তদন্ত দল (এস আই টি) অভিযোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীকে নির্দোষ বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তবুও অভিযোগের তির বন্ধ হয়নি। অধুনা সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে অনেকেই মোদীর রক্তমাখা হাত দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এসবই যে ভোটবাক্স রাজনীতির লক্ষ্যে বলা হয়েছে, সেটা নিশ্চিত; কিন্তু ভারতের অজ্ঞ, নিরন্ন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন দরিদ্র কোটি কোটি ভোটদাতাদের দেখুন, স্বইচ্ছায় ভোটদান করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা আর একবার প্রমাণ করলেন যে তাঁরা সত্যটি জানেন। তাঁদের দাবি— উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, রোজি-রুটি-মকান। আর ভ্রষ্টাচারহীন প্রশাসন।

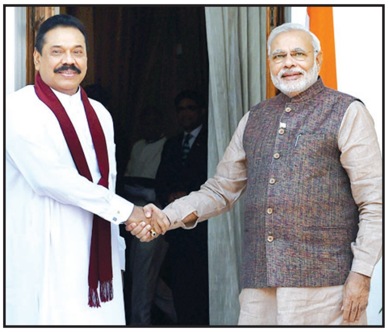
রাজাপক্ষের সঙ্গে মোদী

নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়লাভই করেননি, তাঁর দল লোকসভায় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের শক্তি দেখে বিশ্ব হতবাক। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক সময় তাঁকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল, এখন তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যৌথভাবে উন্নয়নে আগ্রহ প্রদর্শন করছে।

'টাইম' ম্যাগাজিন (২৬.৩.২০১২) কভারচিত্র হিসাবে মোদীর ছবি প্রকাশিত করে তাঁর অশেষ গুণাবলীর তথ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। উত্তর প্রদেশের উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'নই-দুনিয়া' সাপ্তাহিকে শাহিদ সিদ্দিকি অনুরূপ ভাবে মোদী প্রশস্তি গেয়েছেন। মোদী ঘোষণা করেছিলেন, ''আমি যদি প্রকৃত দোষী হই, ক্ষমা ভিক্ষা করে শাস্তি লাঘব করা যায় না, আমায় মৃত্যু দণ্ড দিন''। ওয়ালস্ট্রীট জার্নালও শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ে (২৯.৮.২০১২) তাঁর চিন্তাভাবনার বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু ভারতে তাঁর প্রতিপক্ষ ব্যক্তিগত কুৎসার সমুদ্র রচনা করেছে। ভোট বড় বালাই। 'কিস্সা কুর্সিকা'।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ এশিয়ায় 'সার্ক' রাষ্ট্র সমিতির প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিলেন। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা অনুপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সংসদের স্পিকার এসেছিলেন।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অতিথি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঞা নওয়াজ শরিফ। পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আই এস আই- এর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি ভারতে আসার সাহস দেখিয়েছেন এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ত্রাসবাদ এবং বিশেষ করে ২৬/১১-র ঘটনার পর ভারতের কঠোর মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বরফ গলানোর এই প্রয়াস বলেই অনেকের ধারণা। মোদী-নওয়াজ বৈঠক সন্তোষজনক হয়েছে বলে উভয় পক্ষই ঘোষণা করেছে। সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য উভয় রাষ্ট্রের বিদেশ সচিব আলোচনায় বসবেন। ভারত জানিয়ে দিয়েছে পাক-ভূখণ্ড সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করতে দেওয়া থেকে নিরস্ত হতে হবে। যে কোনোভাবে ওই ভূখণ্ড থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানো বন্ধ করা পাক-সরকারের দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, ২৬/১১-র অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আজও ভারতকে 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন' হিসাবে স্বীকার করেনি। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। আসলে, পাক সামরিক বাহিনী পাক সরকারকে বোঝাচ্ছে, এই সুযোগ দিলে ভারত পাকিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার করে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ায় আমদানি রপ্তানি করবে। তাতে পাকিস্তানের কি লাভ হবে? আসলে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর তিন অঙ্গের যৌথ ফাউন্ডেশন পরিবহন, ব্যাঙ্ক, বীমা, শিল্প, জাহাজ পরিবহন ইত্যাদি হেন ব্যবসা নেই যা করে না, প্রচুর জমির মালিক এই সংস্থা। ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়লে এই সংস্থার ব্যবসায় আঘাত লাগতে পারে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'রেজলিউশন' অনুযায়ী কাশ্মীরের জনমতকে সম্মান জানিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা হোক। তিনি ভুলে গিয়েছেন— রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্ববর্তী দুই সেক্রেটারি জেনারেল ঘোষণা করেছেন, ওই 'রেজেলিউশন' এখন মৃত। ৬৭ বছরে ঝিলম, বিতস্তা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশিত শর্তগুলির একটিও পাকিস্তান পালন করেনি। বরং কত লক্ষ পাকিস্তানিকে শরণার্থী সাজিয়ে অথবা অবৈধ ভাবে জম্মু কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, কত কাশ্মীরি তরুণকে টাকার লোভ দেখিয়ে অথবা বলপূর্বক পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে সুফি চিন্তা ভুলিয়ে জেহাদি চিন্তায় মগজ ধোলাই করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে শস্ত্র-সহ

ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? উপত্যকা থেকে পণ্ডিতদের ঝেটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনা করে, তাদের কি হবে? কত নোটভর্তি সুটকেস সৈয়দ সালহাউদ্দিন লাহোরে বসে এই কাজের জন্য এবং শ্রীনগরে সৈয়দ আলী শাহ জিলানী পেয়েছেন সে তথ্যই বা কত জন রাখেন? মাসুদ আজহার, হাফিজ সঈদ পাকিস্তানে 'হিরো' হয়ে ঘুরে ঘুরে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন, তাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

তবে আলোর নিশানা, এই প্রথমবার নওয়াজ শরিফ পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আই এস আই-কে অমান্য করার সাহস দেখিয়েছেন। যদি ওই দুই সংস্থাকে তাদের নিজেদের কাজের সীমানায় আবদ্ধ রাখতে পারেন এবং তালিবান ও জেহাদিদের লাগাম পরাতে সক্ষম হন তাহলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারত-পাক সমস্যা মেটান তখন সহজ হবে। ততদিন ভারতকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং নওয়াজ শরিফের হাত শক্ত করতে হবে। মনে হয় প্রধানমন্ত্রী মোদী সঠিক পথই ধরেছেন।

শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষে। কিছুদিন যাবৎ ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী এল টি টি ই প্রধান প্রভাকরণকে গ্রেপ্তার করার প্রয়াসে অগণিত তামিল নরনারীকে হত্যা করেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। ভারত এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিলেও, শ্রীলঙ্কা সরকারকেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল।

তদন্তের পক্ষে ভারতের এই সমর্থন শ্রীলঙ্কার মানুষ ও সরকার পছন্দ করেনি। তার উপর ভারতের ধীবররা প্রায়সই শ্রীলঙ্কার জলসীমার মধ্যে প্রবেশ করে ফেলছে এবং গ্রেপ্তার হচ্ছে। চীন বেশ জাঁকিয়ে শ্রীলঙ্কায় ঢুকে পড়ে অর্থ এবং কারিগরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় রাজাপক্ষের ভারত আগমন ভারতের পক্ষে বিশেষ বার্তাবহ। তামিলনাড়ু সরকার ও জনগণ রাজাপক্ষেকে আমন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

বর্তমানে শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায় হতোদ্যম এবং মাথা নীচু করে জীবন যাপন করছেন। যখন শান্তিসেনা জাফনা প্রায়দ্বীপে ছিল, শ্রীলঙ্কা সরকার তামিলদের প্রতিটি ইচ্ছা দ্রুত পূরণ করেছিল। সংবিধান সংশোধন করে আলাদা তামিলরাজ্য গঠনের শর্তও পূরণ করেছিল। সেই সময় বিধানসভা গঠনের জন্য নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রভাকরণের অবিমৃষ্যকারিতা ও দম্ভের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের একে একে হত্যা করল। অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এখনও বেঁচে রয়েছেন। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী জাফনা অঞ্চলে ব্যারাকে গৃহবন্দী হয়ে সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে আজ সেই রাষ্ট্রে তামিলরা মাথা উঁচু করে বাঁচাতে পারত। তামিলনাড়ুর মানুষ, ভাইকোর মত নেতারা এ তথ্য জানেন না এমন নয়। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রভাকরণ বিশ্বাসঘাতকতাও করেছিল। শান্তি বাহিনী স্বদেশে ফেরার পর শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী তামিলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঘটেছিল নির্মল গণহত্যা। সে দায় তাদের নিতেই হবে এবং দোষীদের শাস্তি পেতে হবে। রাজীব গান্ধী-সহ বহু সাধারণ মানুষের হত্যার জন্য এলটিটিই-ও দায়ী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষের আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। আশা করব রাজাপক্ষে ভারতের প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করতে পেরেছেন। ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক আবার আগের মতো প্রগাঢ় হবে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৈরালা অনুষ্ঠানে এসে নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। সংবিধান রচনা নিয়ে তিনি এখনও গভীর সঙ্কটে। ভারতে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা দেখে তিনি নিশ্চয় সাহস সঞ্চয় করে অগ্রসর হতে পারবেন। সেখানেও চীন প্রবলভাবে পদক্ষেপ রেখেছে। ভারতের বিশিষ্ট বন্ধুরাষ্ট্রেও তারা ভারত-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস করছে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় খুশি। পরিস্থিতি যাই-ই হোক ভারত সে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহযোগিতা করেই যাবে। হেরাতে ভারতীয় দূতাবাসে পাক-তালিবান হামলা মনে হয় পাক আই এস আই-এর শেষ প্রচেষ্টা, যদি কোনোভাবে আরও একটা অশান্তি সৃষ্টি করা যায়, যাতে নওয়াজ শরিফের ভারতে আগমন ভেস্তে যেতে পারে। আফগান সুরক্ষা কর্মীরাই অবস্থা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ এশিয়ায় 'সার্ক' রাষ্ট্রগুলিতে এক মৈত্রীর বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন, ভারতের উন্নয়ন প্রয়াসে এই উপমহাদেশের সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর সঙ্কল্প।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, 'শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না', অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ভারতের মতো সুবৃহৎ প্রতিবেশীর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যও প্রত্যাশা করে। সেখানেই যত বিপত্তি। যখন ভারতের গড়-উন্নয়ন ছিল বাৎসরিক ১০ শতাংশ হারে তখনও ভারত সেই অর্থ সাহায্য দিতে পারেনি, আজ সেই হার ৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। চীন ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রগুলিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তারা ভারত অপেক্ষা চীনকেই কাছে টানতে আগ্রহী। সেই একই অবস্থা 'এশিয়ান' গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও। ভারত না দিতে পারে আর্থিক সাহায্য এবং না দিতে পারে সামরিক সাহায্য। চীনের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতাও ভারতের বর্তমানে নেই।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বাড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মার্কিন বিদেশমন্ত্রীও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্ট্রাটেজিক অংশীদার হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং ফোনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে চীন-ভারত সম্পর্ক আরও গভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। চীনের বিদেশমন্ত্রী এই মাসেই আলোচনার জন্য ভারতে আসবেন।

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক নতুন বার্তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে— ভারত জেগে উঠেছে, ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াও। ■

ঢাকা মানেই আওয়ামী লীগ নয় দিল্লীকে এখন এটাও বুঝতে হবে

সাধন কুমার পাল

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র বিপুল জয়ে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেনি। এই উচ্ছ্বাস এতটাই যে নির্বাচনের ফলাফল পরিষ্কার হওয়ার পর, হাসিনা নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আগেই বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ভারতের হাই কমিশনের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, জুনের মাঝামাঝি ভারতে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বিএনপি নেত্রী সবুজ পাসপোর্টের আবেদন করেছেন। বিএনপি শিবিরের ভাষ্য অনুসারে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র এই জয়ে শেখ হাসিনা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ শিবির নাকি মুষড়ে পড়েছে।

ঐতিহাসিক কারণে নেহরু-গান্ধী পরিবার ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মতো প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দুর্বলতা বরাবরই এই দুই দেশের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় বাড়তি মাত্রা যোগাতে সহায়ক হয়েছে। সন্দেহ নেই যে ২০০৮-এ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে গজিয়ে ওঠা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সমস্ত শিবির ভেঙে দিয়ে, দু'দেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও আলফা জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিয়ে, শুধু ভারত সরকার নয় ভারতীয় জনগণেরও আস্থা অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে দমন করে, সন্ত্রাস দমনে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিনিময়ে ভারতও আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ কথিত 'সীমান্ত হত্যা' রুখতে নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে ঝুঁকিগ্রস্ত করে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বিএসএফের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে লাটিসোঁটা তুলে দিয়েছে, ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দিয়েছে তিনবিঘা করিডর। চলতি বছরের গোড়ায় বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দিতে তড়িঘড়ি করে তিস্তার জলচুক্তি ও ছিটমহল বিনিময়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি

> "আওয়ামী লীগের বন্ধু হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উপর যে অনাস্থা ও অবিশ্বাস বি এন পি শিবিরের আছে সেটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের উপর নেই। এই কারণেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের রসায়নকে এক নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী বিগত সরকারগুলির চেয়ে অনেকটাই বাড়তি সুবিধা পাবেন।"

গোষ্ঠীগুলিকে পাকিস্তানের আই এস আই মার্কা দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে দেখার এবং এদের বাংলাদেশের মাটিতে শিবির গড়তে দেওয়ার মদত দানের অভিযোগে অভিযুক্ত বি এন পি-জামাত শিবিরের চোখে দুই দেশের এই ধরনের আদান প্রদানকে হাসিনা-কংগ্রেস সম্পর্কের ফসল বলে প্রতিভাত হলেও ভারতে কিন্তু কখনই এই ধরনের উদ্যোগকে ওই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয় না।

সন্ত্রাসবাদের সমস্যায় তিতিবিরক্ত ভারতীয় জনগণ এটাই মনে করে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী শক্তির ধারক বাহক শেখ হাসিনাকে মদত দেওয়ার অর্থ শুধু ভারত নয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটিতে পরিণত হতে না দেওয়া। সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে ভারতীয় জনমানস এতটাই স্পর্শকাতর যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের প্রশ্ন তুলে তিস্তাচুক্তি রূপায়িত হতে না দেওয়ার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতার বিরুদ্ধে পর্যন্ত খালেদার পক্ষে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন। বিএনপি-র শিবিরের ধারণা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের সক্রিয় মদত, সাহস ও কলকাঠি নাড়ানোর জন্যই বিরোধীশূন্য নির্বাচনে জিতে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মসনদ দখল করেছে ও টিকিয়ে রাখতে পারছে। ভারত সরকারে কংগ্রেস দলের অনুপস্থিতির জন্য দুর্বল হয়ে পড়া শেখ হাসিনার পক্ষে বাংলাদেশে ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। নরেন্দ্র মোদীর জয়ে এমন একটি ভাবনায় ভাবিত হয়ে বি এন পি শিবির নতুন করে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বিএনপি শিবিরের ইচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী শেখ হাসিনাকে চাপ দিয়ে বাংলাদেশেও ভারতের মতো অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। খালেদার মতো বাংলাদেশে রাজনীতিতে কোণঠাসা কট্টর ভারত-বিরোধী জামাত-এ ইসলামির কার্যকরী আমির মকবুল আহমেদও নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বলে পরিচিত বিএনপি-জামায়েত শিবির আপাতত ভারত বিরোধিতা সরিয়ে রেখে প্রতিবেশী ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করিয়ে বাংলাদেশে আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে বি এন পি আজ বিরোধী হিসেবে থাকলেও কাল ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্ন দেখবে

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ।

এটাই স্বাভাবিক। প্রতিবেশী ভারতে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের জেরে ক্ষমতায় ফেরার জন্য বি এন পি আন্তর্জাতিক সমর্থনের স্বপ্ন দেখবে এতেও অন্যায় কিছু নেই।

তবে, আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস বন্ধু। সুতরাং বিজেপি কংগ্রেসের রাজনৈতিক শত্রু বলে আওয়ামী লীগেরও শত্রু হবে এবং সেই হিসেবে বি এন পি-র বন্ধু হয়ে যাবে এমন তত্ত্বে মোদী সরকারের সমর্থন লাভের অঙ্ক অবাস্তবই নয় অসম্ভবও বটে। ভারত তথা ভারতীয় জনগণের সমর্থনের স্বপ্ন দেখার আগে খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী শক্তি ও বাংলাদেশে ভারতের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মদত পাওয়ার ব্যাপারে ভারতের স্পর্শকাতরতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের ভোটারদের এই সত্য বোঝাতে হবে দু'টি দেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য এতটাই যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে শত্রুতা মানে ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষতির ভাগই বেশি। এই ক্ষতি এমনই যে, ভারতকে কোণঠাসা করার জন্য বাংলাদেশের বন্ধুত্ব প্রত্যাশী চীনের মতো শক্তিশালী দেশের পক্ষেও পূরণ করা সম্ভব নয়।

বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারতের বাংলাদেশ নীতি আজ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কটিকে ওই দেশের স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত আওয়ামী লীগের বন্ধুত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে —এই বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা হলেও বাস্তবতা আছে। ভারতের দুর্বল কূটনীতি খালেদার জিয়াদের এটা কখনো বুঝিয়ে উঠতে সাফল্য লাভ করেনি যে ভারতবিরোধিতাকে রাজনৈতিক মূলধন করলে আখেরে ক্ষতিই হবে। কারণ ভারতের মতো নিকটতম প্রতিবেশীর আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া ওই দেশে ক্ষমতা ভোগ নিষ্কন্টক হবে না।

পৃথক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে বিরাট অবদান থাকা সত্ত্বেও ভারতের বাংলাদেশ নীতির দুর্বলতা, প্যান ইসলামিক শক্তির দোসর ও পাকিস্তানি

মনস্তত্ত্বে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত বিএনপি-জামায়েত জোটের সামনে, ওই দেশকে ভারত-বিরোধী শক্তির আস্তানায় পরিণত করার এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। ফলে কোন পথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও আস্থা অর্জন করা যাবে এই প্রশ্নে ভারতের বাংলাদেশ-নীতি এক দিশাহীন বিদেশ নীতিতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার জল দিয়ে না তিস্তার জল দিয়ে, দশ হাজার একর বাড়তি জমি গচ্ছা দিয়ে ছিটমহল বিনিময় করে না তিন বিঘা করিডর ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দিয়ে, ভারত- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রহরারত বি এস এফের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের বদলে লাঠিসোঁটা তুলে দিয়ে না অলিখিত ভাবে চোরা পথে গোরু পাচার ও অনুপ্রবেশ অবাধ করে দিয়ে— কোন পথে বাংলাদেশকে খুশি করা যাবে তা নিয়ে ভারতের বাংলাদেশ-নীতি কার্যত দিশেহারা।

ভারতের এই দিশেহারা ও দুর্বল বাংলাদেশ-নীতির জন্য আজ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ, চোরাকারবার, গো-পাচার, নারীপাচারের মতো জঘন্য অপরাধের নিরিখে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত হয়েছে। বি এন পি-জামায়েত শিবিরের হাতে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিতে থাকলেও ভারত সরকারকে কখনো কড়া ভাষায় আপত্তি জানাতে দেখা যায়নি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে পেট্রডলার-মদত-পুষ্ট ভারতবিরোধী ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল মসজিদ-মাদ্রাসা। হিন্দুশূন্য হতে হতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বসবাসকারী জনগণের ধর্মীয় ভারসাম্য বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। এই সুযোগে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা ভারতের সীমান্ত গ্রামগুলিতে কার্যত সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা বলছে, এখন ভোট হলে খালেদা জিয়াই জয়ী হবেন। এই রকম পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়া ভারতের বন্ধুত্ব প্রত্যাশী হয়ে এগিয়ে আসছেন এটিও একটি বড় ব্যাপার। আওয়ামী লীগের বন্ধু হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উপর যে অনাস্থা ও অবিশ্বাস বি এন পি শিবিরের আছে সেটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের উপর নেই। এই কারণেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের রসায়নকে এক নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী বিগত সরকারগুলির চেয়ে অনেকটাই বাড়তি সুবিধা পাবেন। ঠিক যে সুবিধেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় ও জঙ্গলমহলের আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে পেয়েছিলেন। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১০.০০ টাকা

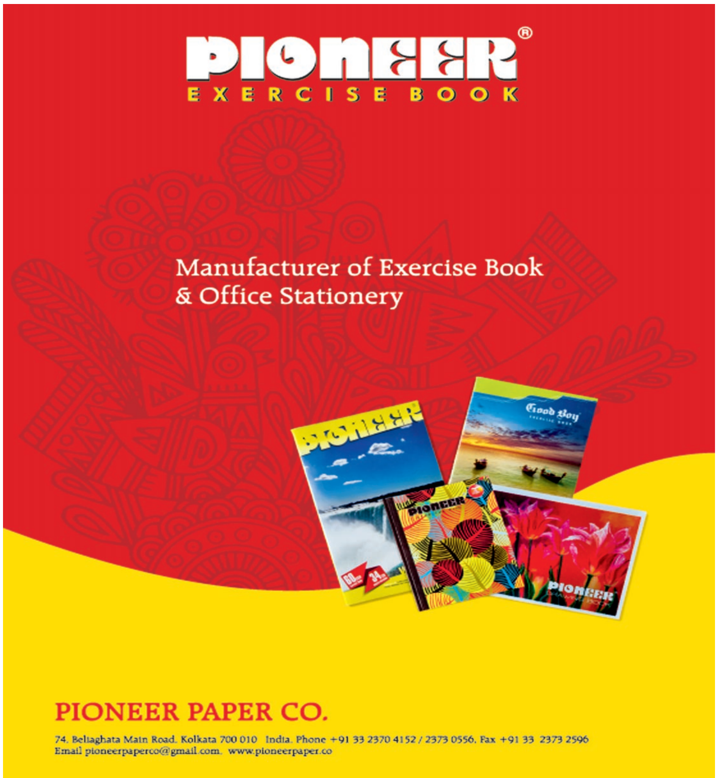

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চিঠিপত্র

মোদী ঝড়

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গড়েছে। আর এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস বেশির ভাগ আসনে (৩৪/৪২) জিতে গেল। যেখানে সারা ভারতবর্ষে বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দল (তামিলনাড়ু, ওড়িশা বাদে) এমনকী কংগ্রেস দলও শেষ হয়ে গেল সেখানে মমতার টিকে থাকার কারণটা কি?

পশ্চিমবঙ্গ বিগত ৩৪ বছর রাহুগ্রস্ত হয়ে একটা দমবন্ধ অবস্থায় ছিল। শত চেষ্টা করেও মুক্তি পাচ্ছিল না। প্রফুল্ল সেন, গনিখান, সিদ্ধার্থ রায়, বিজেপি নেতৃবৃন্দ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেও মুক্ত করতে পারছিলেন না। তাদের আন্দোলনটা খাপছাড়া খাপছাড়া ছিল, কিন্তু মরণপণ ছিল না।

এখানের জনগণের একটা ধারণা আছে যে বিজেপির রাজত্ব ভাল ছিল এবং আবার বিজেপি-র রাজত্ব-ই চাই। কিন্তু এখানে বিজেপি কোথায়? বিজেপি-কে ভোট দিলে সিপিএম আবার ফিরে আসবে, তাই সিপিএমের থেকে মমতা ভাল এই টনিক কাজ করছে। তারপর যখন নরেন্দ্র মোদী জনসমক্ষে এলেন তখন এ রাজ্যেও বিজেপি-র একটা জোয়ার লক্ষ্য করা গেল।

তাহলে মমতা এত আসন পেল কী করে? অবশ্য রিগিং, বুথ দখল, ভয় দেখানো, কারচুপি অবশ্য-ই অন্যতম কারণ হতে পারে। আসল কারণ হচ্ছে মুসলমান ভোট, বেশিরভাগ মুসলমান বিজেপিকে পছন্দ করে না, তাঁরা কিছুটা সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। তাঁরা দেখছে বিজেপি-র বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি বা দল শক্তিশালী বা জেতার সম্ভাবনা বেশি তাঁকেই ভোট দাও। তাই দেখি মালদা মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের জয় আর দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়। তাই মমতার পশ্চিমবঙ্গে এত জয়। নাহলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা অন্যান্য রাজ্যে মুসলমানরা এককাট্টা হতে পারল না কেন? সব থেকে বড় কথা ওখানে হিন্দুরা জাতপাত ভুলে মোদীজীকে সমর্থন করেছে। তাই লালু, নীতিশ, মুলায়ম, বহেনজীর ভরাডুবি। তবে এটা অনস্বীকার্য ভারতবর্ষের সর্বত্র এই নির্বাচনে হিন্দুদের অনেকটা এককাট্টা ভাব পরিলক্ষিত করা গেছে। অতীতে তাঁরা অসহায়ভাবে বিভিন্ন পার্টিকে সমর্থন করে গেছে, এখন তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।

কমল মুখোপাধ্যায়,
চুঁচুড়া, হুগলী।

॥ ২ ॥

এবার ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকালে এক প্রলয়ঙ্কর মোদী ঝড় বয়ে গেছে দেশ জুড়ে। আর সেই ঝড়ে কুপোকাত প্রায় সব রাজনৈতিক দল। কারা নেই সেই দলে? কংগ্রেস, এসপি, বিএসপি, আরজেডি, জেডি (ইউ), ডি এম কে, অগপ, আপ, এনসিপি, এনসি, সিপিএম, সিপিআই ইত্যাদি। আবার এদের মধ্যে বিএসপি, আর জেডি, ডিএমকে, কংগ্রেস মোদী-ঝড়ে এতটাই বিপর্যস্ত যে লোকসভায় তারা বিরোধী দলের স্বীকৃতিটুকুও হারিয়েছে।

শুধু কি তাই? নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ভাবমূর্তি, বাচনভঙ্গি ও জনপ্রিয়তার কাছে কংগ্রেসের 'যুবরাজ' রাহুল গান্ধী যে নিতান্ত শিশু, তাও এবার প্রমাণিত হয়েছে।

তবে বিভিন্ন সংস্থার করা জনমত সমীক্ষা ও বুথ ফেরত সমীক্ষা এবার হয়েছে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত। ওইসব সংস্থা বিজেপি ও এনডিএ-র যত আসন পাওয়ার আভাস দিয়েছে, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি আসন পেয়েছে তারা। মোদী-ঝড় সব হিসেব নিকেশ, ভবিষ্যদ্বাণীকে ভেঙে চুরমার করেছে। বহু নেতা-নেত্রী নির্বাচনী প্রচারে সব ভব্যতা-সভ্যতার মাথা খেয়ে মোদীকে করেছেন কদর্য ও কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ, অসম্মান ও সমালোচনা। মোদী কিন্তু নোংরামির আশ্রয় না নিয়ে সব আক্রমণ, অসম্মান ও সমালোচনাকে প্রতিহত করেছেন শান্তভাবে এবং শালীনতা বজায় রেখেই। আর এখানেই ওই ভণ্ড রাজনীতিকদের সঙ্গে মোদীর মৌলিক পার্থক্য এবং প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতাও প্রমাণিত।

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ডিগবাজি

১৬ মে, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোনো পর্যন্ত দু-একটি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব সংবাদপত্র, প্রায় সব সাংবাদিক, নিবন্ধ লেখক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক নেতারা বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর নিন্দামন্দ, গালি-গালাজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করা ছিল নিয়মিত রুটিন অ্যাফেয়ার। সেই সঙ্গে চলত দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গার মুখ ইত্যাদি বলে হুমকি। 'দাঙ্গাবাজ' কথাটি নরেন্দ্র মোদীর নামের আদ্যক্ষর (PREFIX) হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো মোদীকে কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে ঢোকানোর হুমকি দিয়েছিলেন। তা এখন বিপুল ভোটে জিতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। মমতা কি তা আটকাতে পারলেন? বরং এখন দিল্লীতে তাঁর মুখ দেখানোই দায়। তাই মোদী আমন্ত্রণ করলেও তা গ্রহণ তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওদিকে বিহারের লালুপ্রসাদ প্রায়ই হুমকি দিতেন যে তিনি বেঁচে থাকতে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেবেন না। মোদীর গুরু আদবাণীর মতো তাঁর শিষ্যকেও তিনি আটকে দেবেন। মোদীতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। এখন জানতে ইচ্ছে করে লালুপ্রসাদ কি বেঁচে আছেন না স্ত্রী-কন্যাকে 'ডুবিয়ে' দিয়ে তিনিও ডুবেছেন?

দক্ষিণের কন্নড় সাহিত্যিক অনন্ত মূর্তি বলেছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি দেশত্যাগ করবেন। যখন বিজেপি কর্মীরা তাঁকে করাচির বিমানের টিকিট ধরাতে গেলেন তখন তিনি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বলছেন, "আমি যাব কোথায়? এইখানে এই মোদীর রাজত্বেই থাকব।" এখানে আমাদের নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বহুদিন আগেই বলেছিলেন যে তিনি 'দাঙ্গা মোদীকে' ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান না। মোদী

প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি আর এদেশে থাকতে চান না। তা জানতে ইচ্ছে করে তিনিও কি দেশত্যাগ করেছেন? এঁদের মতো অনেকেই মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশ ত্যাগের হুমকি দিয়ে এখন সব অস্বীকার করে বলেছেন যে তাঁদের কথা ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

এবার আমি সেইসব সংবাদপত্রের কথায় আসছি যারা প্রতিদিন নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ বলে মুণ্ডপাত করতো। তাঁরাও এখন ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজী খেয়ে মোদীর মধ্যে নানা গুণ দেখতে পাচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় ভুলেও কেউ আর 'দাঙ্গাবাজ' কথাটি উল্লেখ করছেন না, দাঙ্গাবাজ কথাটি সমাজ জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে। একেই বলে ডিগবাজি। রাজনৈতিক নেতারা (মমতা সমেত) মুখে কুলুপ এঁটেছেন, মোদীর তীব্র সমালোচক সাংবাদিকরা একেবারে চুপসে গেছেন। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যিনি ক্ষমতায় থাকার সময় হুমকি দিতেন ''দু চার পিস আর এস এস-কে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।'' কিন্তু মোদী আরও ভয়ঙ্কর। তিনি এখন মোদীর রাজত্বে কি করেন তা দেখার কৌতূহল রইল।

২০০২ সাল থেকে আমেরিকা বার বার হুমকি দিয়ে আসছিল যে 'দাঙ্গাবাজ মোদীকে' আমেরিকা যাওয়ার ভিসা দেবে না। আর এখন মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়া মাত্র স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওবামা মোদীকে আমেরিকায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কোনো ভিসা-ফিসার দরকার নেই। একেই বলে ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজি। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ডিগবাজির কথা বলে শেষ করছি। ১৬ মের আগে এই দুই সংস্থার খবর ছিল শুধু ডঃ সিং এর বন্দনা ও মোদী বিরোধিতায় ভরপুর। ১৬ মে-র পরে তা হয়েছে শুধু মোদীময়। ডঃ সিং উধাও।

সুহাস বসু,
কলকাতা-৬০।

মোদীর সামনে চ্যালেঞ্জ

জনতা জনার্দনের দু'হাতভরা আশীর্বাদে নরেন্দ্র মোদী ২৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন। তিনি যে মুকুট পরে প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে বসেছেন, সেই মুকুট কিন্তু অজস্র কাঁটাযুক্ত। যেমন— আর্থিক দুর্দশা, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, বেকার সমস্যা, দারিদ্র, প্রতিবেশী দেশের বিরোধিতা, সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডব, অনুপ্রবেশ সমস্যা ইত্যাদি। আরও বিভিন্ন রকমের কাঁটা মাথায় তুলে নিতে চলেছেন। তবুও দেশবাসী তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখেছেন। যুব সম্প্রদায়ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যদি তিনি করতে পারেন তবে অন্য সব চ্যালেঞ্জকেও তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারবেন।

মনীন্দ্র নাথ সাহা,
গাজোল, মালদহ।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ

বিশ্বের অনেক দেশেই অনুপ্রবেশ এক অন্যতম সমস্যা। বলাই বাহুল্য যে ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ক্রমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এব্যাপারে স্বস্তিকার ১৯ মে সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অবশ্যই যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। আর উত্তর কোরিয়া, ইরান, চীন, আফগানিস্তানের মতো দেশে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কড়া ব্যবস্থা থাকলেও এদেশে তাদের বহাল তবিয়তে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে এরাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রেশনকার্ড, ভোটারকার্ড ইত্যাদি করে দেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যসরকার স্থায়ীভাবে থাকার সুবন্দোবস্ত করে দেয়। অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসভায় এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর কথা বলায় এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। আবার তিনিই দেশের কান্ডারি নরেন্দ্র মোদীকে দেশের ইতিহাস জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ইতিহাস জানেন না। তাই অনুপ্রবেশ ও শরণার্থীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নেই। আর বাংলাদেশে হিন্দু নরনারীদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের ফলে তারা বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে সচেষ্ট হয়ে আছে। ফলে বিশেষত এ রাজ্যে ভয়ঙ্কর পরিবেশ গড়ে উঠছে। সরকারিভাবে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার জঙ্গি প্রশিক্ষণেও অংশ নিচ্ছে এই অনুপ্রবেশকারীরা।

তাছাড়া এর আগে এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জনগণনার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে দেশের নাগরিকত্ব পেতেও তাদের সুবিধা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যেও পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ রোধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। বরং পরোক্ষে মদত দিয়ে গেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চুরি, ডাকাতি, গোরু পাচার-সহ নানা অপরাধমূলক কাজকর্মে ব্যাপৃত। আবার মুসলিম সমাজ জন্মনিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এরাজ্য তথা সারাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই সংখ্যালঘুরা এদেশে বসবাসের আইনি স্বীকৃতিও পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ অনুপ্রবেশ এরাজ্য তথা দেশের কাছে অন্যতম প্রধান সমস্যা যে কোনো ভাবেই বন্ধ করা দরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ। দেশের জাতীয়তাবাদী সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে তা বলাই বাহুল্য।

সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলি।

নেপালের প্রাচীন নগর ভক্তপুর

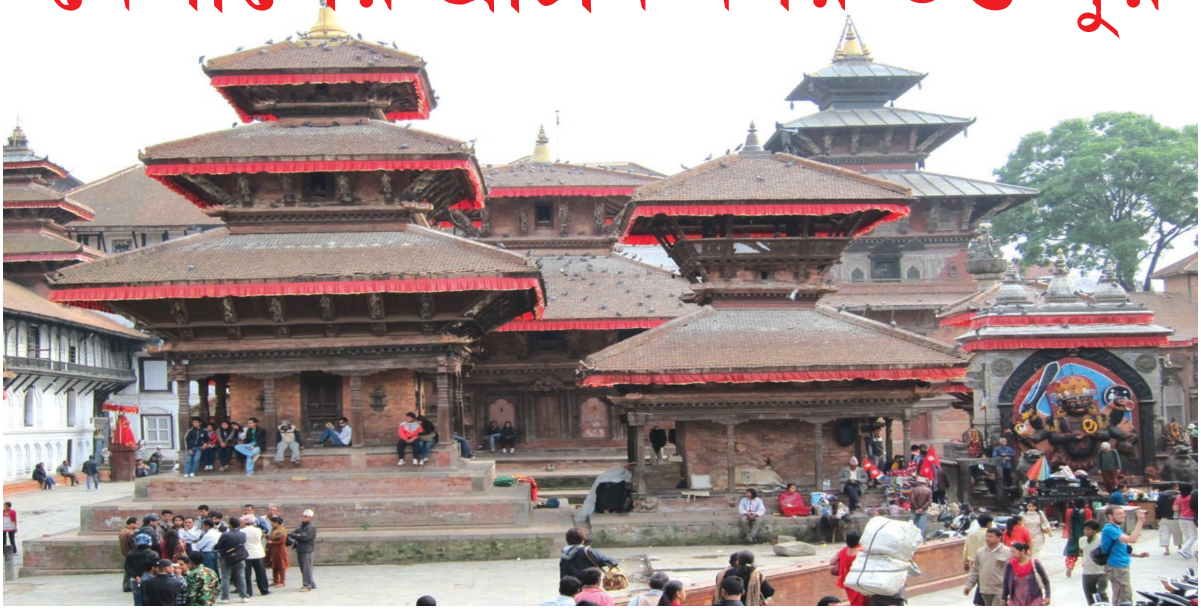

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নেপালে রাজত্ব করেছেন তখন তিন নৃপতি। প্রাচীন নগর ভক্তপুরে গেলে অতীতের অনেক নিদর্শন উজ্জ্বলভাবে সামনে হাজির হবে। কাল আর সময়কে যথাযথ রেখে প্রাচীন এলাকার গৌরব ধরে রাখার আন্তরিক উদ্যোগ রয়েছে। কাটমান্ডু উপত্যকার পূর্বদিকে প্রাচীন নগর ভক্তপুর। মন্দিরময় ভক্তপুর। মন্দিরগুলো কাঠ, ধাতু আর পাথরের তৈরি। পুরনো দিনের ইঁটে তৈরি বাড়ি। অত্যন্ত যত্নে সব রাখা হয়েছে। ইউনেসকো এই অঞ্চলকে ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল ঘোষণা করতে চলেছে।

কাটমান্ডু উপত্যকার তৃতীয় বড় শহর স্বয়ম্ভু। সেখান থেকে ভক্তপুর পনেরো কিলোমিটার। একসময় ভক্তপুর ছিল উপত্যকার তিনটি নতুন রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়। অন্যদুটো রাজ্য ছিল কাটমান্ডু আর পাটান। এমনকী ভক্তপুর নেপালের রাজধানী ছিল বিখ্যাত মল্ল রাজাদের আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্ধেক পর্যন্ত।

এখন স্থানীয় লোকজন বলে পুরনো নাম— ভাদগাঁও কিংবা খোওপা। এই নামের অর্থ ভক্তিমানদের নগর। হ্যাঁ এটা ভক্তিমানদের নগর এই কারণে এখানকার বা পুরোন নগরের বাড়িগুলোর পাশে রয়েছে একের পর এক মন্দিরের চূড়া। আর তার মধ্যে রয়েছে দেশের সেরা ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিচয়। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। দুপাশে মন্দির। পথ দিয়ে হাঁটলে চোখে পড়বে অনেক শিল্প সামগ্রীর বিপণি। তাঁত বস্ত্র ও মাটির পাত্রের দোকান। অনেক দোকানে প্রাচীন গয়না বিক্রি হচ্ছে। সব কিছুর দাম বেশ কম কাঠমান্ডুর ব্যবসা-সচেতন দোকানগুলোর থেকে।

পুরনো নগরে ঘুরতে গেলে কেনাকাটার ব্যাপার থাকে। কিন্তু সেখানকার লোকজন কীভাবে স্বাগত জানাচ্ছে বা ব্যবহার করছে সেই অভিজ্ঞতাই থেকে যায় স্থায়ীভাবে মনের মধ্যে। মূল দরবার চত্বরে দেখা যাবে অনেকটা সিংহের মতো দুটো পাথরের মূর্তি। বহুকাল আগে তৈরি। শতকের পর শতক দাঁড়িয়ে আছে।

এই চত্বরে অনেক বাড়ি। বাড়িগুলো প্যাগোডা ও শিকারা রীতিতে তৈরি মন্দির। পঞ্চান্ন জানালার প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে। ওই প্রাসাদ ইঁটে গাঁথা। জানালাগুলো খোদাই করা। পঞ্চদশ শতাব্দীর কাজ। তার মধ্যে রয়েছে সময়ের স্বাক্ষর বা পরিচয়। রাজা ও দেবদেবীকে কেন্দ্র করে খোদাই কর্ম। শিল্পকর্ম চারপাশে। উপরে

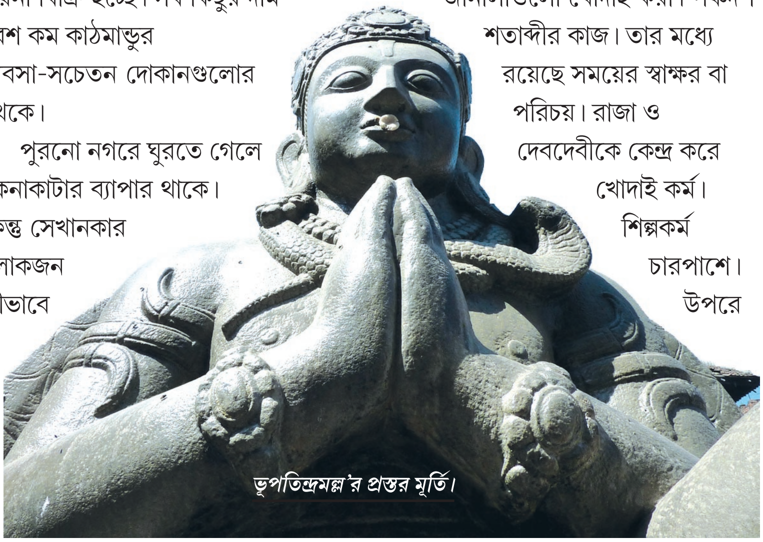

ভূপতিন্দ্রমল্ল'র প্রস্তর মূর্তি।

নিচে পাশে, দরজায় জানালায় মন্দিরের উপরে খিলানে। দেখতে দেখতে অবাক হতে হয়। অসাধারণ শিল্পকর্ম। রাজ্যকে ওইসময়ে অন্যরকম গৌরব দিয়েছিল হয়তো। মল্ল রাজারা ওখানে রাজত্ব করে দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী। তাদের যোগসূত্র ছিল ভারতের সঙ্গে। শোনা যায় তারা ভারত থেকে বিতাড়িত হয়। তথ্য মেলে মহাভারতের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধ লিপিতেও তাদের পরিচয় মেলে। নেপালের মল্ল বংশ ক্ষমতা পায় ১২০০ শতাব্দীতে। হিমালয়ের ওই অঞ্চলের রাজত্বে সেটাই ছিল স্বর্ণযুগ। স্থায়িত্ব লাভ করেছিল সাড়ে পাঁচশো বছর।

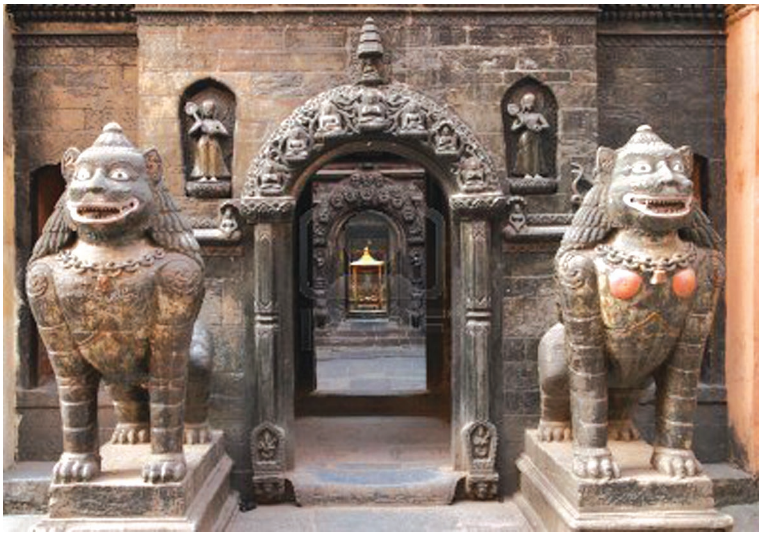

মূল দরবার চত্বরে সিংহের মতো দুটো পাথরের মূর্তি।

সিংহ মূর্তিওয়ালা দরজা পেরিয়ে প্রধান চত্বরে পেঁছোলে দেখা যাবে ভবনমালা। অসাধারণ স্থাপত্যের নিদর্শন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বর্ণদ্বার। স্থানীয় পরিচয় লু দৌকা। দরজায় সোনার তৈরি মূর্তি আছে দেবী কালিকার ও পৌরাণিক এক দেবীর। তার সঙ্গে রয়েছে অন্য মূর্তি। দরজা পেরিয়ে যেতে হবে মূল চত্বরে। সেখানে আছে তালেজু দেবীর প্রাচীন মন্দির।

পরম্পরাবাহিত রীতি ছিল মন্দিরের দরজা শুধু শাসক রাজাদের জন্যে খোলা থাকবে। এখন সেই নিয়ম নেই। সকলের জন্যেই খোলা। না, সকলের জন্যে নয়। শুধু হিন্দুদের জন্যে। চমৎকার খোদাই করা খিলান আর জানালার মধ্যে পৌরাণিক প্রাণীর মূর্তি, যার মধ্যে সৌন্দর্য ও শৈল্পিক পরিমিতিবোধ যথেষ্ট।

এই মন্দির একটা বিরাট বাড়ির অংশ। সেই বাড়িকে বলা হয় পঞ্চান্ন জানালার প্রাসাদ। তৈরি হয়েছিল বহু বছর আগে। তখন রাজা ছিলেন যক্ষ মল্ল। এই প্রাসাদ নতুনভাবে তৈরি হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লর উদ্যোগে।

বাইরে একটা স্তম্ভে রয়েছে ভূপতিন্দ্র মল্লর মূর্তি। প্রাসাদের দিকে মুখ করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশাপাশি একই মাপের আলাদা মঞ্চের উপর ব্রোঞ্জের তৈরি বড় ঘণ্টা রয়েছে। এক সময় ওই ঘণ্টা বাজানো হোত প্রার্থনার সময়। কিংবা কোনও বিশেষ ঘোষণার প্রয়োজন হলে। আরও দুটো উল্লেখযোগ্য মন্দির রয়েছে ওইখানে। একটি বাটশালা মন্দির, ওই দেবতার নামে তৈরি। আর একটা পশুপতি মন্দির। কাটমাণ্ডুতে যে বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির রয়েছে তারই আদলে তৈরি। বেশ শক্তসমর্থ কাঠামো ওই চূড়ার।

পুরো কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় যেসব উঁচু বাড়ি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। পাঁচতলা সমান উঁচু বলা যেতে পারে। নেপালের সব থেকে উঁচু মন্দির। তৈরি হয়েছিল ১৭০২ খৃস্টাব্দে। তখন রাজা ভূপতিন্দ্র মল্লর শাসনকাল। জানা যায় প্রকৃতির বোধ থেকেও ওই মন্দির রক্ষা পেয়েছে। ১৯৩৪ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প নেপালের অনেক ক্ষতি করেছিল। কিন্তু ওই মন্দিরের সামান্যই ক্ষতি হয়েছিল।

পায়ে পায়ে মন্দির চত্বরে ঘোরা যায়। চারপাশে কত শিল্পসামগ্রী। এক জায়গায় রয়েছে বিখ্যাত রাজপুত কুস্তিগীর জয়মাল্য ও ফাটুর মূর্তি। রয়েছে হাতির মূতি— যেন পাহারা দিচ্ছে। ফুলের চমৎকার কাজ। ঘণ্টা সমেত সিংহ, দুই দেবী বাহিনী ও সিংহিনী। সমস্ত মূর্তিই বেশ শক্তপোক্ত। বহু যুগ পেরিয়ে দিব্যি রয়েছে। এই মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছে সিদ্ধি লক্ষ্মীকে। এই সিদ্ধিলক্ষ্মী হলেন দেবী দুর্গার রক্তপিপাসিনী এক রূপ। মূর্তি ভীষণ দর্শনা। মূল মন্দিরে শুধু মন্দির পুরোহিতরাই ঢুকতে পারেন। দর্শনার্থীরা দেখেন মন্দির চত্বরে দেবীর অন্যান্য মূর্তি। মূল মূর্তির থেকে যাদের রূপ কম ভয়ঙ্কর। সেই মূর্তিগুলি খোদাই করা আছে দরজায় ছাদে।

প্রধান মূর্তি আর স্মারক যেমন রয়েছে ভক্তপুরে তেমনি আছে আকর্ষণ। যা দেখার জন্যে দলে দলে মানুষ যায় নিয়মিত। মন্দিরের উঁচু চাতালে স্থানীয় পুরোহিতরা পুজো করে ভক্ত থাকুক বা না থাকুক। স্থানীয় কাছেপিঠে যে বাজার বসে সেখানে দেখা যায় মেয়েরা আনাজ বিক্রি করছে। অন্যান্য মুদিখানা দোকানেও বিক্রেতা মেয়েরাই।

দোকানে দোকানে নেপালি পশমিন বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। প্রতিযোগিতা চলেছে জোরদার। ওই সময়েই চোখে পড়ল স্থানীয় এক চিত্রকর আঁকছেন এক কিশোরের ছবি। জোরালো রেখা এবং সাবলীল। দেখে মনে অনুরাগ জাগে। যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। তবে অবশিষ্ট যা রয়েছে তা তো আকর্ষণীয় এত বছর পরেও। ■

বট-সাবিত্রী ব্রত

শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনাদিকাল থেকেই প্রকৃতিকে মা মনে করে পূজা করার প্রথা চলে আসছে। আমাদের মুনি-ঋষিরা জানতেন 'একটি গাছ একটি প্রাণ'। তাই অরণ্য সংরক্ষণ ভারতীয় পরম্পরার মধ্যেই আছে। একে ধর্মীয়রূপ দিয়ে আমরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করে চলেছি। আমলকি নবমী, নিম সপ্তমী, তাল নবমী, কদলী ব্রত, অশোক ষষ্ঠী, বিল্বরাত্রি ব্রত, অশ্বত্থ ব্রত, তুলসীবিবাহ ইত্যাদি বৃক্ষ সংরক্ষণের নামান্তর মাত্র। এরকমই একটি বট-সাবিত্রী ব্রত।

বটবৃক্ষ আকার, রূপ ও আয়ুতে বিশাল হয়। হাজার হাজার বছরের পুরনো বটবৃক্ষও দেখা যায়। তার ছায়াও সুশীতল। পুরাণে বটের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলা হয়েছে—

'বটমূলে স্থিতো ব্রহ্মা,
বটমধ্যে জনার্দনঃ।
বটাগ্রে তু শিবোদেব,
সাবিত্রী বট সংশ্রিতাঃ।।'

অর্থাৎ বটবৃক্ষের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে বিষ্ণু, উপরিভাগে শিব এবং মধ্যে সাবিত্রী দেবী বাস করেন।

হিন্দু বিবাহিতা মায়েরা তাঁদের স্বামীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং পুত্রকন্যাসহ পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত করেন। জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী থেকে শুরু করে অমাবস্যা পর্যন্ত পূজা ও ব্রত পালন করা হয়। সম্ভব না হলে শুধুমাত্র চতুর্দশী বা অমাবস্যায় এই ব্রত করা বিধি আছে। তবে বাঙালি মায়েরা চতুর্দশীতেই এই ব্রত পালন করেন। তাই একে সাবিত্রী চতুর্দশীব্রতও বলা হয়।

বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে এই ব্রত পালন করা হয়। একটি পাত্রে সপ্তধান্য অর্থাৎ সাতরকমের শস্য রেখে তার ওপর ব্রহ্মা-সাবিত্রী মূর্তি বা চিত্র রেখে এবং অন্য একটি পাত্রে একইভাবে সাতরকমের শস্যের ওপর সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্তি বা চিত্র রেখে কোনো বটবৃক্ষের নিচে মায়েরা সমবেতভাবে পূজা করেন। আগের রাত্রি থেকেই মায়ের উপবাস থেকে সংযম পালন করেন। পূজা অবশ্য পুরোহিতরাই করেন। পূজার মধ্যেই মায়েরা বটগাছের গোড়ায় পুকুর বা নদী থেকে আনা জল ঢেলে পূজা করা হলুদমাখা সুতো বটগাছে জড়াতে থাকেন। সুতো জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমা চলতে থাকে। পরিক্রমা ৩ বার, ৫ বার থেকে ১০৮ বারও হতে পারে। সধবা মায়েরা স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় শেষে অর্ঘদান করেন। পূজার সামগ্রী সবই ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। তার আগে অবশ্য 'বট-সাবিত্রী ব্রতকথা' কোনো একজন মহিলা বলতে থাকেন, বাকি সবাই ধান-দূর্বা হাতে নিয়ে ভক্তিভরে শুনতে থাকেন।

ব্রতকথা সংক্ষেপে এরকম— মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী খুবই বিদুষী ও নম্র ছিলেন। রাজপরম্পরা অনুসারে মনে মনে সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে স্বামীরূপে বরণ করেন। তারপর দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে জানান যে সত্যবানের আয়ু খুবই কম। তার মৃত্যুর তিথিও বলে দেন। রাজা সাবিত্রীকে তার সিদ্ধান্ত বদলের কথা বললে সাবিত্রী রাজি না হয়ে সত্যবানকেই বিবাহ করেন। সেই সময় সত্যবানের মাতা-পিতা অন্ধ ও রাজ্যহীন হয়ে বনে বসবাস করছিলেন। সাবিত্রীও দীনহীন অবস্থায় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বনেই বাস করছিলেন। নারদের কথামতো সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যুর তিনদিন আগে থেকেই নিরম্বু উপবাস শুরু করেন। নির্দিষ্ট তিথিতে সত্যবান অচেতন হয়ে পড়লে সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে কাঁদতে থাকেন। সে সময় স্বয়ং এসে সত্যবানের প্রাণ নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সাবিত্রীও তাঁর সাধনার বলে যমরাজের পিছনে পিছনে যেতে থাকেন। যমরাজ অনেকরকম ভাবে সাবিত্রীকে বুঝিয়েও নিরস্ত করতে না পারলে খুশিমতো বর প্রার্থনা করতে বলেন। সাবিত্রী তিনটি বর চেয়ে নেন। প্রথম— তাঁর শ্বশুর যেন হৃতরাজ্য ফিরে পান। দ্বিতীয়— শ্বশুর-শাশুড়ি যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। তৃতীয়— তিনি যেন শতপুত্রের জননী হন। এভাবে সাবিত্রী নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তির দ্বারা যমরাজের থেকে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে নেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির দৃষ্টিশক্তি ও হৃতরাজ্য ফিরে পেয়ে সন্তানলাভের সৌভাগ্যও লাভ করেন।

মূল কথা হলো, ঘরে শিক্ষিতা ও ভক্তিমতী মেয়ে যদি বধূরূপে আসে— তাহলে সেই ঘর বা বংশ ধন্য হয়ে যায়। বট-সাবিত্রী ব্রতের মতো বাংলায় জামাই ষষ্ঠীর খুবই প্রচলন আছে। আসলে এই ব্রতেরও মূলরূপ হলো— অরণ্য-ষষ্ঠী বা স্কন্দষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত একেবারে বট-সাবিত্রীব্রতের মতোই পালন করা হয়।

আজকাল শহরগুলিতে এই ব্রত পালন করার সময় বট গাছের ডাল ভেঙে বা কেটে এনে করা হচ্ছে। বট বা অশ্বত্থ গাছের ডাল ভাঙা বা কাটা খুবই দোষের। এতে ব্রতের মূল ভাবনাই ব্যাহত হয়। শহরের শিক্ষিত মানুষরা ভুলে যাচ্ছেন যে এই ব্রতের মূল ভাবনাই হলে বৃক্ষ-সংরক্ষণ। তাই বটগাছের তলায় বসেই এই ব্রত পালন করলে সবারই দীর্ঘায়ু লাভ হবে। ■

নবাঙ্কুর

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাল তড়িৎরা

কৌশিক গুহ

ওরা কেউই রাজনীতির খবরকে আমল দেয় না। বড়োরা ওইসব নিয়ে যখন হইচই চেঁচামেচি করে তখন মজা পায়। তড়িৎ ভাবে একবার চেঁচিয়ে বলবে, 'কি হচ্ছে কি, চুপ করো তোমরা!' তাতে কি হবে? বড়োরা কেউ কেউ হয়তো লজ্জা পেয়ে চুপ করে যাবে। আবার দু'চারজন বলবে, 'এ্যাই তুই কেন এখানে? যা অন্য জায়গায়।' তড়িৎ জবাব দিতে পারে, 'তোমরা মাঠে গিয়ে চেঁচাও না। ঘরের মধ্যে পাড়ার মধ্যে গোলমাল করছো কেন?' সে জানে তার পক্ষে অনেকেই থাকবে। কারণ রাজনীতি নিয়ে বিশ্রীভাবে চেঁচামেচি একশো জনের মধ্যে ৯৮ জনই চায় না। তড়িৎ তার ভাবনা জানিয়েছে অজয়-স্যারকে। তিনি বলেছেন, 'তুমি ঠিকই ভেবেছো। বড়োরা ভুল করলে বলা দরকার বৈকি। বড়োরা যদি না শোনে তাহলে তাদেরই ক্ষতি। আমি যেমন স্কুলের হেডস্যারের কথা শুনি তেমনি শুনি ক্লাস ওয়ানের কোনো ছেলের কথাও।' তড়িৎরা ঠিক করেছিল দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা কার্ড পাঠাবে। ছবি আঁকবে ওরা। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। নীল আকাশের উপর লেখা হবে : 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজী, আমাদের শ্রদ্ধা আর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' নিচে সই করবে ক্লাসের প্রত্যেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলো। কার্ড ঝকমক করছে। পাঠানোও হবে পরের দিনের ডাকে। তড়িতের ভাবনায় হঠাৎ উঁকি দিলো, যেরকম চিঠি যাচ্ছে তাতো অনেকেই পাঠাচ্ছে। নতুনত্ব কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীর মন দিয়ে দেখার ব্যাপারও থাকছে না। এমন কিছু করতে হবে যা প্রধানমন্ত্রী ভালোভাবে দেখবেন। ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করে ফেলল দশজন দশটা বাক্যে জানাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দশটা প্রস্তাব। সেগুলো কাগজে লেখার পর ছবি আঁকবে শুভঙ্কর। অজয়-স্যার উৎসাহ দিলেন।

ধৃতিমান লিখল, 'আমাদের দেশের সব শিশু কিশোরের কথা ভাববেন আপনি আন্তরিকভাবে।' ভাস্কর লিখল, 'দেশের অনেক জায়গায় ছোটোরা নানারকমভাবে কষ্ট পায় সেদিকে আপনি দেখবেন।' বোধিসত্ত্ব লিখল, 'স্কুলের সব ছেলেমেয়ের শরীর নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।' সুকল্যাণ লিখল, 'সব স্কুলে খেলার মাঠ থাকার ব্যবস্থা করবেন।' অর্জুন লিখল, 'ছোটোদের মারধোর নানাভাবে কষ্ট দেওয়া বন্ধের ব্যবস্থা করবেন।' দিবাকর লিখল, 'দেশের সব শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর মতো সব শিশুর শরীর মন যাতে ঠিকমতো গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।' মানব লিখল, 'প্রতিদিন আপনি এক ঘণ্টা ছোটোদের জন্যে বরাদ্দ করবেন।' অসীম লিখল, 'আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, সব শিশু-কিশোরের কথা ভাববেন আপনি।' দীপক লিখল, 'ছোটোদের কাছে যদি আপনজন হতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গে থাকবে সবাই।' নিরূপ লিখল, 'আপনি ছোটোদের বন্ধু হয়ে তাদের জন্যে কিছু কাজ করুন প্রতিদিন।'

বাংলার-স্যার হিমাংশুবাবু বলেছিলেন, 'কথাগুলো হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেওয়া হোক।' ইংরেজির-স্যার প্রভঞ্জনবাবু বললেন, 'কোনো দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দেশের সব ভাষা জানা লোকজন আছেন। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন।' চিঠি চলে গেল। কদিন বাদে একটা বার্তা এলো প্রধানমন্ত্রী চিঠি পেয়েছেন।

তড়িৎ বলল বন্ধুদের, 'আমরা জানিয়েছি প্রধানমন্ত্রীকে কিছু কথা যার মধ্যে সব ছেলেমেয়ের জন্যে ভাবা হয়েছে। আরও অনেকে হয়তো জানাবে। প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন।' অজয়-স্যার বললেন, 'সব প্রধানমন্ত্রীকে মনে রাখতে হয় দেশ প্রত্যেক মানুষের। মানুষের কথা ভাবলেই ছোটোদের কথা এসে যায়। তাদের ভালো ভাবে লালন করলে দেশ এগোবে অনেকটাই।'

তড়িৎ ঠিক করেছে এরপর একদিন সকালে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করে জানাবে তার আরও কিছু ভাবনার কথা। অজয়-স্যার বললেন, 'অবশ্যই জানাবে। দেখাই যাক না কি হয়।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

নতুন বইয়ের গন্ধ আর আকাশ

ক্লাসের সকলের মতো আকাশেরও খুব ভালো লাগে নতুন বইয়ের গন্ধ। অনেক সময় নতুন ক্লাসে ওঠার পর পুরনো বই হাতে আসে। মনটা ভার হয়ে যায়। নতুন বই হাতে এলে তার অন্যরকম সুবাস। মন ভরিয়ে দেয়। পড়া-হোক বা না-হোক বই নিয়ে মেতে থাকার মধ্যেও আনন্দ। শুধু নিজের স্কুলের ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে ওইরকম ব্যাপারটা দেখেনি আকাশ, বাড়িতেও দেখেছে মা দাদু-দিদাও নতুন বইয়ের গন্ধ ভালোবাসে। ওরা তো ছোটো নয়, স্কুলেও পড়ে না। ওদের কেন নতুন বইয়ের গন্ধ ভালো লাগে! দিদা বলেছে, 'ছোটোবেলায় যেসব ভালো লাগা জিনিস থাকে তা সারাজীবন রয়ে যায়। বইয়ের গন্ধ ঠিক তেমনি। নতুন বই হাতে নিলে প্রথমে গন্ধ শুঁকে দেখি সেই ছোটোবেলার অভ্যেসে।' আকাশের মাসতুতো ভাইবোন শ্রেয়শ্রী আর সুদীপ্ত একই কথা বলে।

শ্রেয়শ্রীকে দাদু আবার মাঝে মাঝে নতুন বই কিনে দেয়। রঙচঙে ছবির বই। সে সকলের ছোটো বলে আদর একটু বেশি পায়। অবশ্য সেজন্যে একটুও হিংসে হয় না আকাশ আর সুদীপ্তর। কারণ জানে বোনকে বই দিলে তা পড়বে তারাও। ছোটোদের বই পড়তে ভালোবাসে দাদু, দিদা, মায়েরাও। আকাশকে পড়ায় বরাবর উৎসাহ দিয়েছে দাদু। সবসময় বলেছে, 'পড়াশোনার মতো জিনিস নেই। পড়াশোনাকে ভালো লাগলে বই বন্ধু হয়ে যাবে।' আকাশ বইকে বন্ধু করে নিয়েছে। নানারকম বই সে মন দিয়ে পড়ে।

আরেকটা জিনিস সে দেখেছে যেটা তাদের ক্লাসের অনেকেই জানে না। বই কীভাবে তৈরি হয় সেটা কজন আর জানে! আকাশ জেনেছে ওর দাদুর বাড়িতে ছাপাখানা থাকায়। দাদু বড় বড় করে ওর নাম ছেপে দিত সুন্দর বর্ডার দিয়ে। তাতে ক্লাস রোল স্কুলের নাম লেখা থাকত। তা কেটে কেটে বইয়ের মলাটে লাগিয়ে দিত দাদু। হাতের লেখা পড়ে অক্ষর সাজানো। তারপর ছাপা। ছাপার পর বাঁধা। বাঁধার পরেই বই হয়ে ওঠে ছাপা কাগজগুলো। মলাট আর ভিতরের অক্ষরগুলো তখন অন্যরকম চেহারা নেয়। বড়োদের বই আর ছোটোদের বই একেবারে আলাদা। তবে তৈরি একভাবে, গন্ধটাও একরকম। বড়োরাও অনেকে বই হাতে পেলে নিশ্চয়ই গন্ধ শোঁকে। দাদু বলেছে, 'এই গন্ধটা কাগজ কালি বোর্ড আঠা এসব মিলিয়েই তৈরি হয়। জিনিসগুলো সুন্দরভাবে মিলেমিশে যায় বলেই ওইরকম সুবাস ছড়িয়ে যায়।'

আকাশ দাদুর কাছে জেনেছে, আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়তে পারে না। তাদের হাতে বই পৌঁছোয় না। তাদের খুব কষ্ট। রোজ পেটভরে একবেলাই খেতে পায় না। দাদুর কয়েকজন প্রকাশক বন্ধু আছে যারা গরিব ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় বই দিয়ে আসে প্রতিবছর। দাদু বলেছে ছোটোরা প্রত্যেকে যাতে স্কুলে আসতে পারে সেজন্যে সারাদেশ জুড়ে ব্যবস্থা আছে। তবু অনেকে আসতে পারছে না। এসব কথা শুনে খুব খারাপ লাগে আকাশের। বলে 'আমি বড়ো হয়ে ওদের জন্যে কিছু করবো।' দাদু নাতিকে আদর করে বলে, 'এই মন নিয়ে এগিয়ে চলো। সব কিছুতে বড়ো হও। বইও এই কথা বলবে।'

বইমিত্র

স্কুলের সামনে খাবারের দোকান

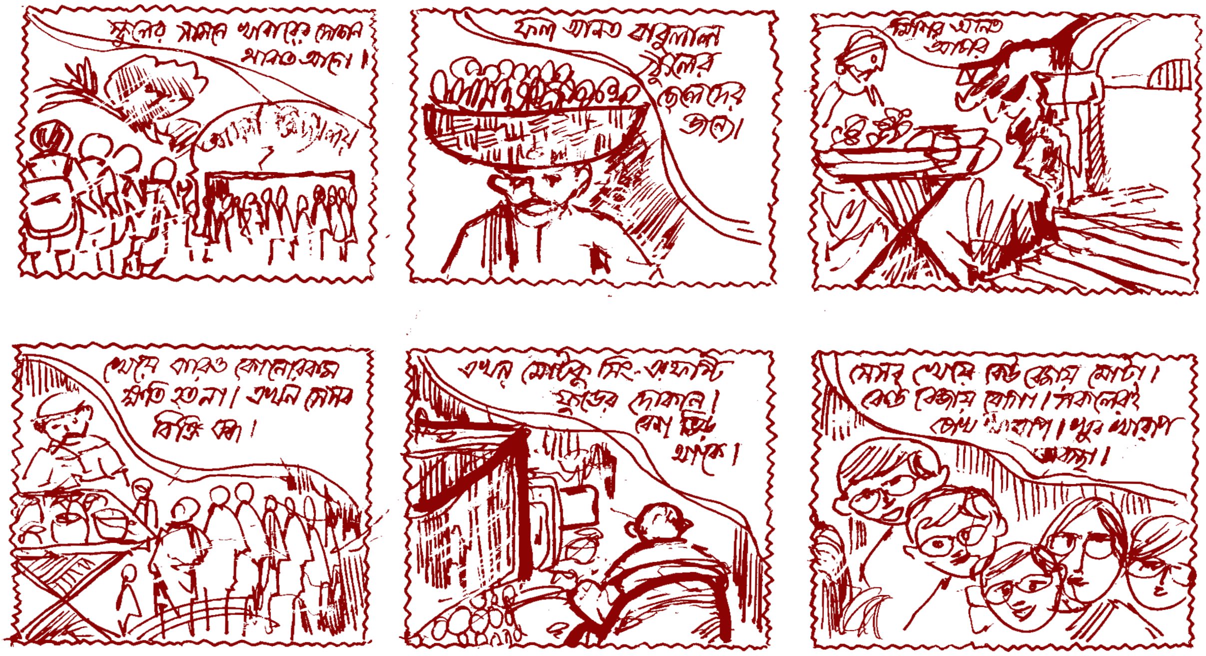

যৌথপরিবারে নারীর ভূমিকা

চিন্ময়ী রায় দে

‘সুখী পরিবার’ কথাটি বললে প্রথমেই মনে আসে হাসিখুশি, আনন্দে মেতে থাকা একটি যৌথ পরিবার। যা শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, জা, ননদ, নন্দাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয়। বর্তমানের নিউক্লিয়ার পরিবারে থেকে যৌথ পরিবারে এই হাসিখুশি, মজা, আনন্দ অনুভব করা যাবে না। বর্তমানে যৌথ পরিবার একটি বিরল দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। দেশে কয়েকটা যৌথপরিবার এখনও দেখা গেলেও কয়জন কুশল জীবন অতিবাহিত করছে তাও একটা প্রশ্ন। কিন্তু একটা বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এর মধ্যেও এককেন্দ্রিক পরিবারের তুলনায় যৌথ পরিবারের সদস্যরা অনেকটাই সুখে ও আনন্দে থাকে। আর এই সুখ ও আনন্দের চাবিকাঠি থাকে পরিবারের মহিলাদের হাতে।

মহিলারা তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বলে এখনও পড়ন্ত সমাজের এই যৌথপরিবারের ধারাকে বজায় রেখে চলেছে। মহিলারাই পরস্পরের মধ্যে বোঝা পরামর্শ করে এই যৌথ পরিবারগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে। আর তারাই জীবনে সার্থক হয়েছে। কারণ এখনকার নিউক্লিয়ার ফ্যামেলি অর্থাৎ এককেন্দ্রিক পরিবারের সন্তানরা একাকিত্বের সঙ্গী। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ব্যক্তি না থাকার জন্য সেই পরিবারের সন্তানদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যৌথপরিবারের ছেলেমেয়েদের মতো তারা ঠাকুমা, ঠাকুরদা, কাকা, কাকিমা, পিসি, জেঠু, জেঠিমার মতো পরিবারের কাছের লোকেদের আদরে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। আর মা, বাবারা তাদের পেশার জন্য ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। কাজেই এই সব পরিবারের ছেলেমেয়ে বা সাধারণত বাড়ির কাজের লোকেদের কাছেই বড় হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। তাই এই সকল শিশুদের মধ্যে একগুঁয়ে ও জেদী দেখা যায়। শুধুমাত্র যে সন্তানদের মধ্যেই এর প্রভাব পড়ে তা নয়, এর প্রভাব মা, বাবার মধ্যেও দেখা যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের মানসিকতার দিকে বাড়ির কর্ত্রীস্থানীয় মহিলাকেই নজর দিতে হয়। পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তাশক্তি কখনও এক হতে পারে না। একটি পরিবারে কেউ থাকে ঝগড়ুটে, কেউ বা খামখেয়ালি, আবার কেউ একটু বেশি সচেতন। এইসব ভিন্নতার জন্যই সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমদৃষ্টিতে স্নেহ-আদরে এই সমস্যার সমাধান করেন মাতৃময়ী কোনো মহিলা।

কল্পনার জগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে। সদ্য বিবাহিতা কোনও মহিলা যদি তার বাবার সঙ্গে স্বামীর তুলনা করে তবে সমস্যা অনিবার্য। কারণ একথা তার মাথায় রাখা উচিত তার বাবার থেকে স্বামীর অভিজ্ঞতা ও বয়স অনেকটাই কম। একটি মেয়ে অন্য একটি পরিবার থেকে এসে সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগেই এক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের সহায়তাই কাম্য। তবেই ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলের মায়েরা ঘরে বৌমা আসার পর ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন, এর অন্যতম কারণ হলো ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়। যার ফলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। আর লোকসমাজে খারাপ প্রতিফলন হয় পুত্রবধূর। এক্ষেত্রেও বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের সচেতনতা অনিবার্য। সমস্যা আছে ও থাকবে, এর মধ্যে জীবনটা গুছিয়ে নিলেই জীবনের সার্থকতা। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্যও দেখা যায়। কখনও শাশুড়ি বৌয়ের অত্যাচারের শিকার হয়। আবার সবকিছু চোখের সামনে দেখেও ছেলে মায়ের দাপটে বৌ-এর প্রতি অন্যায়ে নীরব থাকে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ছেলের ভূমিকাও হস্তক্ষেপ অনিবার্য।

নিজের মেয়েকে অন্যের বাড়ি বউ করে পাঠাবার সময় বলা হয় ‘সুখী হও, মানিয়ে নিয়ো।’ অন্য পরিবারের মেয়ে যখন বধূ হিসেবে আসে তখন তাকে নিজের মেয়ের মতো দেখার মানসিকতা শাশুড়িদের থাকলে অনেক রকম সংঘাত সমস্যা সহজেই এড়ানো সম্ভব হোত। এটা ভাবা দরকার ছেলেমেয়ের বিয়ের আগে, বিয়ের সময়, বিয়ের পরে সেইসব নারীর যাঁরা শাশুড়ি হতে চলেছেন বা হয়েছেন। তবে সব শেষে একটা কথা উল্লেখ্য নারীদের সক্রিয় ভূমিকা, সুস্থ বিচার বুদ্ধি, ধৈর্য ও গঠনমূলক চিন্তাধারার মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি স্থাপন সম্ভব। একজন মহিলাই তার পরিবারের সদস্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। এক কথায় যাকে বলে ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’। ■

অতিথি কলম

ষোড়শ নির্বাচন মধ্যবিত্ত মর্যাদাবোধের পুনরুত্থান

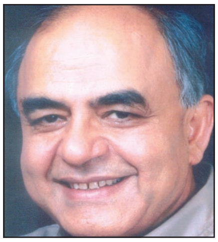

গুরুচরণ দাস

ষোড়শ লোকসভার সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বহুদিন থেকে জনমানসে বাসা বেঁধে থাকা অজস্র অতিকথন বা মিথ ধসে পড়েছে। সেগুলি সমগ্র ভারতব্যাপী নানান রাজ্যের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করলেই নজরে আসবে। কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ একটি পুরস্কার দেশবাসী এই নির্বাচনের মাধ্যমে পেল। সেটি হচ্ছে ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিকভাবে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তেমনি আবার নানান লাইসেন্স রাজ, দীর্ঘসূত্রতা থেকে মুক্তি পেতে ১৯৯১ সালে দেশ বড় সড় অর্থনৈতিক সংস্থানের পথে পা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় অর্থনীতিবিদদের মতে এই পরিবর্তন ছিল সেই অর্থে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু তারও ২৩ বছর পরে গত ১৬ মে দেশবাসী যা পেল তা সেই অর্থে সঙ্গে সঙ্গে চাক্ষুষ করানো যায় না। আসলে তা হচ্ছে জাতীয় মর্যাদাবোধ। আমার বিচারে নরেন্দ্র মোদীর বিধ্বংসী জয়ের এটিই সারাৎসার। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে এই জয় মান্যতা বলুন, সমর্থন বলুন বা স্বপ্নপূরণের প্রথম সোপান বলুন একসঙ্গে সবই উপহার দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের মধ্যে মোদী বিশ্বাস জাগাতে পেরেছেন যে তাদের ভবিষ্যৎ অন্য কারুর দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত নয়। দেশের যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ-তরুণী চাইলে তাদের নিজের চেষ্টায় নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বুর্জোয়াদের মর্যাদা' নামের একটি রাষ্ট্রচর্চার সুলিখিত গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকলস্কি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ঠিক এই রকমই একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফসল হিসেবে উঠে এসেছিল এক প্রাণবন্ত মধ্যবিত্তশ্রেণী। যারা ভবিষ্যতের পাশ্চাত্য সমাজের সমগ্র গতিপথটিকেই পাল্টে দেয়।

মনে রাখা ভাল মোদীকে ভোট দেওয়া ভোটার মাত্রই কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদীর ছাপ মারা নয়। তাহলে ব্যাপারটাকে রাজনীতিগত ভাবে বেশ সরলীকরণ করে নেওয়া যেত। না তা নয়। মোদীর এই ভোটারটি আদতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সদ্য গ্রাম থেকে একটি ছোট শহরে এসেছেন। তিনি একটি মোটামুটি চাকরি পেয়েছেন সঙ্গে একটা মোবাইল ফোনও আয়ত্তাধীন হয়েছে। এইবার তিনি তাঁর বাবার যাপিত জীবনের থেকে আর একটু আধুনিক জীবনের স্বাদ পেতে চান। দেশব্যাপী সভায় সভায় ছাপোষা চা-ওয়ালার ঘর থেকে উঠে আসা সুঠামদেহী, নিজের পায়ে দাঁড়ানো এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষের সুশাসন ও উন্নয়নের কথা তার ভাল লেগেছে। এই বিশ্বাসযোগ্যতা, ভাল লাগার ক্ষেত্রে তাঁর জাতপাত, ধর্ম বা বসবাসের গ্রাম কোনো বিবেচ্য বিষয় বলে তার মনে হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই তার বোধোদয় হয়েছে বাস্তবে দেশবাসীর বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো সহ-নাগরিকের সঙ্গে তার কোনো লড়াই নেই। তার লড়াই সেই পরিস্থিতির সঙ্গে যেখানে ঘুষ না দিলে তার জন্ম সার্টিফিকেট পেতে হাড় হিম হয়ে যাবে।

এই চা-ওয়ালা তার মধ্যবিত্তসুলভ আরও নানান নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে ভরসার কথা শুনিয়েছেন। কাটিয়ে দিয়েছেন এক অজানা ভয়। মনের আনন্দে সে আবিষ্কার করেছে ইংরেজি তেমনভাবে বলতে কইতে না পারলেও জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে কোনো বাধা নেই। আমাদের এই তরতাজা যুবকটি আজ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যদি এক চা-ওয়ালা তেমন ইংরেজি না জেনে আমাদের বিরাট দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সফল দাবিদার হতে পারেন তাহলে ইংরেজি বলতে তেমন চৌকস না হলেও কুছ পরোয়া নেই, সেও পারবে। মানসিকভাবে সে এমন শক্তিমান। সেতো নিজের মাতৃভাষা জেনেও সর্বাধুনিক হতে পারে। দশাশ্বমেধঘাটে মোদীর চমকপ্রদ গঙ্গা আরতি দেখে যথার্থই সে আপ্লুত হয়ে পড়েছে। সত্যিই তো হিন্দু হলে বা নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাবার তো কিছু নেই। তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ', ইংরিজি বলা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এতদিন তাকে হীনমন্যতার অন্ধকূপে ডুবিয়ে রেখেছিল। ধর্মের কথা বলা মানেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকা, যে জন্য তার (তাঁদের মতে) বৌদ্ধিক ব্যাপারে খামতি রয়ে গেছে। ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজ শাসনের পরবর্তী সময়ের এটিই ভয়ঙ্কর উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী ফলশ্রুতি। মনের মধ্যে চাপা ভয় ইংরেজি না জানলে কি হবে! ভোটমঞ্চের দীর্ঘদিন ধরে চলা বর্ণাঢ্য সভাগুলির বক্তৃতার পর বক্তৃতায় নরেন্দ্রভাই মোদী এই সাম্রাজ্যবাদীদের ফেলে যাওয়া লেজ ধরে থাকা মানসিকতা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। তরুণটিকে নবীন মর্যাদাবোধে তেজোদৃপ্ত করে দিয়েছেন। এটিই সম্ভবত মোদীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর একটি চমকপ্রদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোদী তাঁর বক্তৃতাগুলিতে ৫০০ বার উন্নয়ন শব্দটি উচ্চারণ করলে মাত্র ১ বার উচ্চারণ করেছেন হিন্দুত্বের কথা। বাস্তবিক ৯০ এর দশকের সংস্কার-পরবর্তী সময়ের যে তরুণটি

নিজ অধ্যবসায় ও চেষ্টায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার কাছে এই উন্নয়ন কথাটি আসলে এক সাঙ্কেতিক শব্দের মতো কাজ করে। উন্নয়ন শব্দটিকে সে 'জীবনে সুযোগ' পাওয়ার সমার্থক বলে মনে করে। বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে এই সুযোগ পাওয়াটাই বড় কথা আর উন্নয়ন কেবল উন্নয়নই তা দিতে পারে। এমন উপলব্ধি থেকে এখন তাকে টলানো শক্ত। এই পদ্ধতিই সফলভাবে কাজে লেগেছে গুজরাটে, তাই দেশের মধ্যে সুযোগ পাওয়ার মাপকাঠিতে গুজরাট প্রথম। এই সফল মডেল অনুযায়ী সরকার এমন একটা উদ্যোগ-সহকারী পারিপার্শ্ব তৈরি করে দেবে যেখানে ইচ্ছুক উদ্যোগপতিরা নিরূপদ্রবে তাদের কর্মদ্যোগগুলিকে পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বাড়বে সুস্থ প্রতিযোগিতা। এর পরই একটি অদৃশ্য হাতের টানে কর্মদ্যোগের আপন নিয়মেই আসবে স্বাচ্ছল্য। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের উত্তরণ হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আর আপনা-আপনিই বাড়বে জীবনযাত্রার মান।

রাজনীতিকদের দেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যখন দক্ষ আমলাদের নিরীক্ষণের মাধ্যমে বাজারের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য নেমে আসবে তখন তার মধ্যেই থাকবে উদ্যোগপতিদের হাত শক্ত করার, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সব উপাদান। এ প্রসঙ্গে মোদী যখন বলেন উন্নয়নকে এখন আন্দোলনে পরিণত করতে হবে তখন তিনি এটাই বোঝান যে আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে পুঁজিবাদের যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ বিকাশ। এটি কোনো মুখশোঁকাশুকির বা আপসের পুঁজিবাদ নয়। যেখানে নিজেরাই গোপনে সমস্ত বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার এই অলিখিত চুক্তি হয়ে যায় (crony capitalism)। ব্যাপারটা নিয়ে অরবিন্দ ভাগরেওয়াল খুব হুল্লোড় লাগিয়েছিলেন।

অবশ্যই এই বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে মোদীর সঙ্গে পূর্বতন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার বা চীনের 'দেঙ' এর বেশ মিল পাওয়া যায়। এঁরা উভয়েই কিন্তু দেশের মানুষকে বাজারের ওপর আস্থা রাখতে শিখিয়েছিলেন। এই কাজটাই সংস্কারের পুরোধা হিসেবে মনমোহন সিং-এর অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! তিনি তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার পদ্ধতির কথা তাঁর নেত্রী সোনিয়া গান্ধী তো বটেই তাঁর কংগ্রেস দলকেও বোঝাতে পারেননি।

মনমোহনের এই অক্ষমতা থেকে মোদীর কিছু গ্রহণীয় আছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিকে কেন হিন্দুত্বের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার— তা বেশ খোলা মনে বোঝাতে হবে। পূর্বের উল্লেখিত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকলস্কি এই প্রসঙ্গে আবার বলেছেন— উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যে এখন অবস্থা হয়েছিল যে লোকে অন্য সব কিছু ভুলে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা বাজারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

মনে রাখা দরকার পাশ্চাত্যের এখন ক্রমহ্রাসমান আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল। কিন্তু আমাদের উন্নতিশীল দেশে আকাঙ্ক্ষার ব্যারোমিটার আজ ক্রমবর্ধমান। কঠিন লড়াই-এর মাধ্যমে পাওয়া দীর্ঘ অধরা মর্যাদাবোধে বলীয়ান আমাদের নাগরিকরা এখন মোদীকে নির্বাচিত করে দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাসী। তবে হ্যাঁ, একই সঙ্গে এই তরুণ নির্বাচক মণ্ডলী প্রচণ্ড অধৈর্য ও নির্মম। উন্নয়ন ও সুশাসনের যে যুগল প্রতিশ্রুতি মোদী দিয়েছেন তার পূরণ না হলে এই ভোটাররা তাদের নির্মম দিকটি দেখাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। পরবর্তী নির্বাচনেই মোদী তা চাক্ষুষ করার হাতনাতে সুযোগ পাবেন। তবে বল এখন মোদীর আওতায়, তাই খেলাও তাঁর। ■

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

নেত্রদান মহাদান

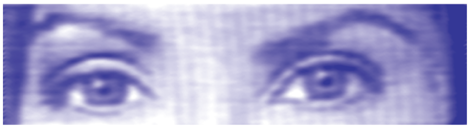

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও ক্ষমতা

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

আমাদের সংবিধানের (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে আমেরিকার সংবিধানের মিল আছে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রপ্রধানের পদের মিল ছাড়া দুটো দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার কোনও সাদৃশ্য নেই। আমাদের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকর গণপরিষদে বলেছিলেন, 'Beyond the identity of names, there is nothing in common between the system prevalent in America and that proposed by the Draft-constitution।' আসলে, আমরা বৃটেনের মতো ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তার ফলে রাষ্ট্রপতিকে বৃটেনের রাজা/রাণীর মতোই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করতে হয়— প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। ডঃ বিদ্যাধর মহাজন এই কারণে মন্তব্য করেছেন, 'The real power rests with him and not with the president, as India has a parliamentary form of Government। বলা বাহুল্য, সংবিধান সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্য শাসক না বললেও কার্যত তিনি সেই ভূমিকাই পালন করেন। এই কারণেই ডঃ জে সি জোহারী লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীই আসলে 'supreme ruler of the land।'

অনুরূপভাবে জি এন যোশী জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক দিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ক্যাবিনেট তথা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, ক্যাবিনেট 'de facto executive' বলেই তার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই পরোক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান।

তবে তাৎপর্যের বিষয় হলো, সংবিধান তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে তেমন ক্ষমতা দেয়নি। ডঃ বি. সি. রাউত মন্তব্য করেছেন, 'With regard to us other functionary, the constitution as so very silent as with regard to the Prime Minister. There are only....... Articles in the constitution which contain some reference regarding the Prime Minister।' কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথা অনুসারে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি হয়ে উঠেছেন প্রধান শাসক।

তাঁর ক্ষমতা ও ভূমিকাকে পাঁচ দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমত, তিনি রাষ্ট্রপতির প্রধান সহকারী ও পরামর্শদাতা। ৭৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁর প্রধান কাজ হলো 'to aid and advise the President।' সংবিধান রচয়িতারা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনেই চলবেন। ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন, 'The President of India will be generally bound by the advice of his Ministers।' ক্যাবিনেটের তরফে পরামর্শটা দেন প্রধানমন্ত্রীই এবং তিনি ক্যাবিনেটের সর্বেসর্বা। সুতরাং একজন ব্যক্তিত্বশালী প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করার সুযোগ রাষ্ট্রপতির নেই। আর তার ফলে যে দীর্ঘ ক্ষমতা-তালিকা রাষ্ট্রপতির হাতে আছে, সেটা চলে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ডঃ এম. ভি. পাইলী তাই মন্তব্য করেছেন, 'The tremendous powers, technically ascribed to him, he does not possess।' বিশেষ করে, সংবিধানের ৪২তম ও ৪৪তম সংশোধন এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করেছে— প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ তিনি গ্রহণ করতে এখন বাধ্য।

অবশ্যই ব্যাপারটা প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মেনে নিতে পারেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে জানিয়েছিলেন যে, কিছু ব্যাপারে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেবেন। নেহরু ওই চিঠির দুটো 'কপি' পাঠিয়েছিলেন সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও অ্যাটর্নি জেনারেল এম. সি. শীতলাবাদের কাছে তাঁদের মতামতের জন্য। তাঁরা দুজনেই কিন্তু জানিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি এই রকমটা করতেই পারেন না।

এতেও দমে না গিয়ে, ডঃ প্রসাদ দিল্লী ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে বলেছিলেন— রাষ্ট্রপতি সব ব্যাপারে ক্যাবিনেটের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নন বলেই তাঁর ধারণা— এই ব্যাপারে আরও পর্যালোচনার দরকার আছে। তিনি সর্দার প্যাটেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাওয়া, বেনারসের ঘাটে পণ্ডিতদের পা ধোওয়ানো, বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে নেহরুকে রুষ্ট করেছেন এবং জেনারেল থিমায়ার পদত্যাগ, তিব্বতনীতি, হিন্দী ভাষার উন্নতি ইত্যাদি নিয়ে নেহরুর সমালোচনা করেছেন, হিন্দু কোড বিল নিয়েও নেহরুর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এই সব কারণে এস. এন. সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'As the President of India, he had at times political differences with the late Jawaharlal Nehru।'

সেই জন্য নেহরু ঠিক করেছিলেন যে, প্রথমবারের মেয়াদ শেষ হলে আর রাজেন্দ্র প্রসাদকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। তবে আবুল কালাম আজাদের চাপে নেহরু নতিস্বীকার করেছেন। কিন্তু ডঃ প্রসাদ তৃতীয়বার মনোনয়ন চাইলে নেহরু আর রাজি হননি। তিনি তখন বেছে নিয়েছেন ড. রাধাকৃষ্ণানকে। তাঁর ধারণা ছিল— এই বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কোনও বিষয়ে দ্বিমত করবেন না, ব্যস্ত থাকবেন বইপত্র নিয়েই। কিন্তু দেখা গেছে— তাঁর ধারণা ভুল। ডঃ রাধাকৃষ্ণানও একেবারে কলের পুতুল ছিলেন না। তিনি নেহরুর চীন-নীতি সমর্থন করেননি— চীনের আক্রমণের পর তিনি নেহরুর তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমনকী, তাঁর চাপে নেহরু তাঁর প্রিয়পাত্র প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন। রাধাকৃষ্ণান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি— তিনি বারবার ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সমালোচনাও করেছেন।

তার ফলে তাঁকেও দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রীই

রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে মুখ্য ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন। গড়ে উঠেছে 'The Prime Minister's President' তত্ত্ব। তাছাড়া দুবার সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর বশে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের প্রধান— ক্যাবিনেট তাঁর ছায়ামাত্র। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য বিশেষ কোনও ক্ষমতা নেই ক্যাবিনেটের ব্যাপারে— তাঁকে বলা হত আপনদের মধ্যে অগ্রগণ্য— 'primus inter pares।' কিন্তু বর্তমানে তিনি ক্যাবিনেটের সর্বেসর্বা— মর্লের (Morley) ভাষায়, 'keystone of the cabinet-arch।'

সেই তুলনায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ অনেক বেশি। সংবিধানের ৭৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি ক্যাবিনেটের 'হেড'। তাছাড়া ৭৫ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে—তিনিই অন্যান্য মন্ত্রীকে বেছে নেন, রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিযুক্ত করেন মাত্র। আর ৭৫ (২) নং অনুচ্ছেদে জানিয়েছে— মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিকাল (pleasure) পর্যন্ত স্বপক্ষে বহাল থাকেন। তবে কার্যত সেটা প্রধানমন্ত্রীরই 'pleasure'। ডঃ এস. সি. কাশ্যপ মন্তব্য করেছেন, 'If the Prime Minister is unhappy or dissatisfied with any Minister, he can advise him to resign no advise the President to dismiss him।' তবে এতটা দরকার হয় না। তাঁর সঙ্গে মতভেদ ঘটলে বা তাঁর অপছন্দ হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই পদত্যাগ করেন। এভাবে বিভিন্ন সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর আর দিবাকর, সি ডি দেশমুখ, কে এম মুন্সী, শন্মুখম চেট্টি, দীনেশ সিং প্রমুখ মন্ত্রী বিদায় নিয়েছেন। সর্দার প্যাটেলও নেহরুর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেননি, তিনি চেয়েছেন নেহরু ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্বের তত্ত্ব মেনে নিন। কিন্তু নেহরু জানিয়েছিলেন— ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব আছে ঠিকই, তবে 'The Prime Minister is supposed to play an outstanding role।' ক্ষুণ্ণ হয়ে প্যাটেল পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে নিরস্ত করে নেহরুর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিহত হওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

যদিও মন্ত্রিসভার সব ব্যাপারে যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, নেহরু কিন্তু দু-একজন ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন এবং সেখানেই বৈঠক শেষ হত। সুতরাং মাইকেল ব্রেচারের মতো বলা চলে— ক্যাবিনেট ছিল নেহরু-নীতির অনুমোদন সংস্থা— তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও ক্যাবিনেট হয়ে উঠেছিল 'registering body— তাঁর কথাই ছিল ক্যাবিনেটের কথা। এই কারণে ডঃ হরিহর দাস[১৩] লিখেছেন 'The constitution of India recognises the pre-eminence of the Prime Minister in the Council of Ministered।'

তৃতীয়ত, সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পেছনে থাকে লোকসভা ও রাজ্যসভার গরিষ্ঠের সমর্থন। সেই জন্য তাঁকে বলা হয় 'leader of the Parliament।' তিনি সরকারের তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন ও নীতি ব্যক্ত করেন। যাতে সরকারের গরিষ্ঠতা পার্লামেন্টে বজায় থাকে, সেটাও তিনি দেখেন। কোনো মন্ত্রী বিরোধীদের সমালোচনায় অস্বস্তিতে পড়লে, তিনি তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়ে সরকারের বক্তব্য পেশ করেন।

অনেক সময় পার্লামেন্টে শান্তি ও সন্ধি বজায় রাখার জন্যে তিনি বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতাও করেন। সুদক্ষ প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনে বিরোধী নেতার সঙ্গে হাতও মেলান। তিনি দেখেন যাতে বিতর্কে সরকারপক্ষের জয় হয়।

চতুর্থত, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দল বা গোষ্ঠীর অবিসংবাদী নেতা হতে হয়। সেই জন্য দক্ষ প্রধানমন্ত্রী দলকে হাতের মুঠোয় রাখতে চান। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য আচার্য কৃপালনীকে পরাজিত করে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন ওই আসন দখল করেছিলেন। কৃপালনী ছিলেন নেহরুপন্থী, আর ট্যান্ডন ছিলেন সর্দার প্যাটেল গোষ্ঠীর। এটা প্রধানমন্ত্রী নেহরু এটা মেনে নিতে পারেননি। প্রশ্নটা ছিল, কে কংগ্রেসকে পরিচালিত করবেন— নেহরু, নাকি ট্যান্ডন? চলাপতি রাউ লিখেছেন, 'The struggle was who was to lead the Congress, Tandon or Nehru ? নেহরু কংগ্রেসকে বলেছিলেন, দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য। তার ফলে নির্বাচনে জয়ী হয়েও ট্যান্ডন বিদায় নিয়েছেন আর নেহরু তখন নিজেই হয়েছেন দলীয় সভাপতি। ১৯৫৪ সালে তিনি ইউ এস ডেবরের অনুকূলে পদটা ছেড়েছেন বটে, কিন্তু আমৃত্যু তিনিই দলীয় সভাপতিকে মনোনীত করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দল ভেঙেছেন। তিনিই সভাপতিও ঠিক করেছেন। নিজেও দলীয় সভাপতি হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও ওই পদ দখল করেছিলেন।

সব শেষে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী হলেন জাতির নেতা। ডঃ এ পি কাপুর মন্তব্য করেছেন, 'The nation looks to the Prime Minister for leadership।' একজন জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বশালী প্রধানমন্ত্রী শুধু তাঁর দল বা গোষ্ঠীর নেতা থাকেন না,

হয়ে ওঠেন জাতির নেতা। এটাই সব প্রধানমন্ত্রীর কাম্য।

এই কারণেই পার্থক্যটা গড়ে ওঠে। ডঃ এন এম শর্মা মন্তব্য করেছেন, 'Not all the Prime Ministers are of one type।' প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইল বলেছিলেন, 'The office of the Prime Minister is what the holder choose to make it।' এটাই সার কথা। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, জনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক করে দেয় প্রধানমন্ত্রী কতটা ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন বা কী ভূমিকা নেবেন।

১৯৭৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস লোকসভায় বিপুল গরিষ্ঠতা পেয়েছিল, অধিকাংশ রাজ্যও ছিল তার দখলে। তার ওপর ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সারা দেশে একটা মোহের সৃষ্টি করেছিল। এইচ এম জৈনের মতে, 'one-party-dominant-system' হয়ে উঠেছিল, 'one-person-dominant-power।' এইচ এন পণ্ডিতের মতে, সেই সময় তিনি যেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দুই পদকে একত্রিত করে ফেলেছিলেন।

অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীরা কিন্তু এটা পারেননি। এই কারণে বলা যায়— অনেকটাই নির্ভর করে দলীয় অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির ওপর। স্বাভাবিক কারণেই চরণ সিং, চন্দ্রশেখর, দেশাই, ভি পি সিং, গুজরাল, দেবেগৌড়া, নরসীমা রাও, বাজপেয়ী, মনমোহন সিং ও রাজীব গান্ধী আদৌ নেহরু-ইন্দিরার জায়গায় পৌঁছতে পারেননি।

তবে এবারের শেষ হাসিটা হেসেছেন মোদী--- (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদী। ■

বিশেষ নিবন্ধ

ছাত্র-শ্রমিকদের বিএমএস ও এবিভিপি-কেও চেনাতে হবে

শ্যামল কুমার হাতি

মন্ত্রিসভাও গঠন হয়েছে। সব মন্ত্রীরাই কাজে ভাল ভাবেই যোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাতে সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ করা যায় তার উপর জোর দিয়ে ১০ দফা কর্মসূচি তৈরি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রীদের বলেছেন, কেউ যেন আত্মীয়দের মধ্য থেকে ব্যক্তিগত সহকারী নিযুক্ত না করেন। কেন এই কথা— মন্ত্রিসভার কেউ যেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর ভাগ্নেকাণ্ডের মতো ঘটনা না ঘটান। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস ও তাদের সঙ্গীরা প্রতিদিন সবকিছুই নজর রাখছে, গণতন্ত্রে এটা খুবই প্রয়োজন। তবে এখানে একটা কথা খুবই পরিষ্কার তা হলো কংগ্রেসীরা যদি সামান্যতম দুর্নীতির গন্ধ পায় তাহলে তারা প্রথমেই শোরগোল করবে না। তারা যেটা করবে তা হলো give and take policy — চুপ থাকার মূল্য তারা নেবে। জনগণ চুপ থাকবে না। বিজেপি আর কংগ্রেসের এখানেই তফাত। বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, কংগ্রেস ততটা নয়। তারা সবকিছুই লাভক্ষতির অঙ্কে বিচার করে। এটা তাদের কালচার। এসব নিয়ে আর বেশি কথা বলা অনাবশ্যক।

বিজেপি যে ভাবে কংগ্রেসের ৬০ বছরের কুকীর্তিগুলো এবারের নির্বাচনে তুলে ধরেছে দেশের সাধারণ মানুষ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে। দেশের যুব তরুণ সমাজ রাজনীতির দিকে তাকাতে বা ভাবতে চাইতো না। মোদীজী তাদেরই এবার রাজনীতি মুখী করতে পেরেছেন। তাদেরি সক্রিয় সমর্থনেই এত বড় বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটেছে। এই যুব সমাজ কাজ চায়। তারা দেখতে চায় সরকারি দলের সকলেই কাজ করুক। মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়াক। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তাই চান। বাজারে একটা চলতি কথা আছে, 'যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। এই ধারণা ভাঙতে হবে। এই ধারণা ভাঙতে পারলেই করে খাওয়া রাজনীতি শেষ হবে। কংগ্রেস আর তার সংগঠন ধরে রাখতে পারবে না। তাসের ঘরের মতো কংগ্রেস সমেত লালু-মায়া-মমতাদের ঘর ভাঙতে বাধ্য। মানুষ এবার বুঝবে লঙ্কায় গিয়ে সবাই রাবণ হয় না, অন্তত রাম তা হননি। এই বিশ্বাস আনতে গেলে শুধু মন্ত্রীদের কাপড় সাদা হলে চলবে না, দলের সমস্ত স্তরের নেতাদেরও কাপড় সাদা হতে হবে। মানুষের অন্নের জন্য বেশি টাকা লাগে না, টাকা লাগে ফাইভ স্টার লাইফ লিভ করার জন্য। মানুষ দুর্নীতি করে শুধু ফাইভ স্টার লাইফ পাওয়ার জন্য। সাধারণ জীবন যাপনে বেশি অর্থের প্রয়োজন নেই। এই বোধ যদি বিগত সরকার দিতে পারত তা হলে কানিমাঝি, এ রাজা বা সুরেশ কালমাদিদের মতো কাউকে আর দাগি হতে হোত না। কানিমাঝি, এ রাজাদের জন্য ডিএমকে সংসদে কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি। মায়াবতীর জাকজমক জীবনযাত্রা দেখে উত্তর প্রদেশের নির্বাচক মণ্ডলী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারাও এবারের সংসদের নিম্নকক্ষে অনুপস্থিত থাকবে। তাই সতর্ক থাকতে হবে।

সারাদেশে মোদীঝড় অথচ আমাদের রাজ্যে সেই ঝড়ে সরকারি দল কিভাবে তার আসন বাড়াল সেটাই আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিজেপি এখান থেকে দুটো আসন পেয়েছে। ১৭ শতাংশ উপর ভোট পেয়েছে। ৪টি আসনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। অনেকগুলি বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে। অনেক পৌর সভায়, ওয়ার্ডেও বিজেপি এগিয়ে। সবচেয়ে অবাক কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রেও বিজেপি লিড নিয়েছে। এ সবই বিজেপি-কে উৎসাহিত করেছে ঠিকই। তবু কেন তৃণমূল কংগ্রেস এতগুলি আসন পেল এবং কিভাবে পেল তারও সঠিক পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এখানে নির্বাচনের আগে ও পরে সন্ত্রাস চলছে। এদের জয় লাভের পিছনে সন্ত্রাস সবচেয়ে বড় কারণ। রাজ্য সরকারের

কাজে মানুষ ভীষণ ভাবে অসন্তুষ্ট। সারদা কাণ্ড সরকারের গলার কাঁটা হওয়া সত্ত্বেও ফলাফল সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে। রাজ্যের এখনও পর্যন্ত সরকারি বিরোধী দল সিপিএম এবং শাসক টিএমসি। তারা বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীকে দোষ দিচ্ছে ভোটারদের বিভাজন করার জন্য। বলতে চাইছে ধর্মের ভিত্তিতে ভোটারদের বিভাজন করা হয়েছে। এর উত্তর মানুষ দেবে। তবে বাংলায় চিরকাল কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে ভোটে বিভাজন করা হয়েছিল। বিজেপি-কে এ রাজ্যে বামপন্থী এবং কংগ্রেসীরা অচ্ছুত করে রেখেছিল। সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে সব সময় তারা গাল পেড়েছিল। ২০১৪ নির্বাচনে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী সবাইকে বোঝাতে পেরেছেন সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে উন্নয়ন বেশি জরুরি। তাতেই সিপিএম সমেত বামপন্থীদের ঘর তাসের ঘরের মতো উড়ে গেছে। সিপিআই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকও সংসদের নিম্নকক্ষে তাদের সদস্য পাঠাতে পারেনি। সেখানে এবার এরাও অনুপস্থিত। আমাদের রাজ্য সরকার বোঝাতে চেয়েছেন এখানে 'সারদা-ফারদা কিছু নয়, সবাই সরকারের উন্নয়নের জন্যই ভোট দিয়েছে।' কথাটা যদি ঠিক হোত তা হলে হেডমাস্টার মহাশয় এতগুলো মন্ত্রীকে কি করে ফেল করিয়ে দিলেন? এই কাজ এবং এই উক্তি কি স্ববিরোধী নয়? আসলে এবারে নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের মনে মোদী-ভয় ঢুকিয়ে ওরা বাজিমাত করেছে। তাই বিজেপিকে এখানে অনেক অঙ্ক কষে এগুতে হবে। ধৈর্য সহকারে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফেরাতে হবে। অনুপ্রবেশ নিয়ে সঠিক ভাবে এবং জেরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যাঁরা এ দেশের নাগরিক, যাঁরা পাকিস্তান গঠনের সময় এদেশটাকে ভালবেসে এখানে থেকে গেছেন তাঁদের কোনো চিন্তা নেই। তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের বিজেপিই রক্ষা করবে। কিন্তু যারা অনুপ্রবেশ করে এখানে এসেছে বা যারা দু-দেশের ভোটার তাদের প্রতি কোনো দয়া বিজেপি দেখাবে না। এই দু' ধরনের সংখ্যালঘুদের এক সঙ্গে মেলালে চলবে না। তাই তো নির্বাচনের সময় অধীর-মমতা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে তাদের ভোট নিজের বাক্সে ভরতে পেরেছেন। এবার সন্ত্রাস কারা করছে এবং কারা করাচ্ছে এ গুলো জনগণকে সঠিক ভাবে জানাতে হবে। শুধু টিএমসি করছে বললেই হবে না। তাদের নাম ও তাদের মাথাদেরও চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয়তাবাদী সংখ্যালঘুদের সাহায্যও এক্ষেত্রে নিতে হবে।

পরিশেষে মানুষকে বোঝাতে হবে মোদীজীর 'সবকা সাথ— সবকা বিকাশ'-এর প্রকৃত অর্থ। এখন অনেকেই বিজেপিতে আসবে। নানান চাহিদা নিয়ে তারা দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সন্তুষ্ট করতে লেগে পড়েছে। যে সব নেতারা দু-একজনকে অনুচর পেত তারা এখন অনেক স্বপ্ন দেখছে। ১৯৭৭ সালে দলে দলে জনতা পার্টিতে লোকেরা নাম লিখিয়েছিল। পরে তারাই সিপিএম-বামফ্রন্টের ভিত শক্ত করেছিল। নেতারা তাদের ধরে রাখতে পারেননি। এবার তাই নতুনদের বেলায় খুবই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দলে দলে লোক এসে আম আদমি পার্টিটার পা গোদের মতো ফুলিয়ে দিয়েছিল। আজ তাদের অবস্থা দেখে শিক্ষা নিতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে— আমরা বাংলার লোকেরা মহামতি গোখলের সেই উক্তি "What Bengal think today, India think tomorrow." খুব গর্বের সঙ্গে মনে করি। প্রশ্ন সত্যি কি বাংলার সেই গৌরব আজ আছে? এখানে যে দল রাইটার্স বা নবান্ন দখল করে, কলেজে ইউনিভার্সিটিতে তাদের ছাত্র সংগঠনের পতাকা উড়ে, ঠিক তেমনি সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের পতাকারও বদল হয়। যেখানে শ্যামল চক্রবর্তী, রাজদেও গোওয়ালিরা সভা করত, এখন সেখানে দোলা সেন, মদনরা সভা করেন। এখন ভাবার সময় এসেছে এটা কি করে সম্ভব? ছাত্র-শ্রমিকের বিশ্বাস এক সঙ্গে কিভাবে বদল হয়? ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে তো তা হয় না। তাই তো যেখানে বিএমএস বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ রয়েছে, সরকারে বিজেপি না থাকলেও বিএমএস অর্থাৎ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ খুবই শক্তিশালী সংগঠন। বাংলা কেন এর ব্যতিক্রম থাকবে। নতুন ছাত্র এবং শ্রমিকদের একই স্থানে না ফেলে তাদের বিএমএস এবং এবিভিপি-কেও চেনাতে হবে। নেতার পিছনে ঘোরার জন্য লোক না রেখে প্রকৃত কাজটি করার প্রয়োজন খুবই জরুরি। না হলে নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়েই ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠনের দিকে নজর না দেওয়াতে এ আই টি ইউ সি এবং স্টুডেন্ট ফেডারেশন কমিউনিস্টদের হাতে চলে গিয়েছিল। আজ তা মনে রাখা দরকার।

অনেক পরে কংগ্রেসীরা আই এন টি ইউ সি এবং এন এস ইউ গঠন করেন। সোজা কথায় দলে কংগ্রেসের কৃষ্টি পরিত্যাগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশ গঠনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকাও সবাইকে জানাতে হবে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ভারতীয় সংস্কৃতির ছোট্ট বাহক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাত্র ২৩ বছর বয়স। দিল্লীর গোলমার্কেটস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বয়সেই শিবচমু বিস্ময় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর বাঁশের বাঁশিতে বাজিয়ে সঙ্গীত জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। অনেক বড় বড় মঞ্চে বংশীবাদন করে অনেক প্রশংসা ও পুরস্কার সে পেয়েছে। সঙ্গীত জগতে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয় তাকে স্কলারশিপ দিতে শুরু করেছে। গত ২১ এপ্রিল দিল্লীতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, দূরদর্শনের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল ড. মহেশ যোশী, সুদর্শন নিউজ চ্যানেলের চেয়ারম্যান সুরেশ চৌহ্বানকে শিবচমুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপর বংশীবাদন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

শিবচমুর বাবা চমুকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও মা সরিতা শাস্ত্রী। দুজনেই সংস্কৃত-বিদ্বান ও সংস্কৃত ভারতীর প্রচারক অর্থাৎ পূর্ণ সময়ের কর্মী। বাবা-মা'র প্রভাবে শিবচমুর মাতৃভাষা সংস্কৃত। মাতৃভাষা সংস্কৃতের মতোই যে মারাঠী, কন্নড়, ইংরেজি ও হিন্দী অনর্গল বলতে ও লিখতে পারে। পড়াশুনাতেও বরাবর তার প্রথম স্থানই দখলে। তাদের পরিবারের সবাই সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলেন। শিবচমুর বাবা চমুকৃষ্ণজী জানালেন--- দশম শ্রেণীর পর শিবচমু পরম্পরাগত সংস্কৃত শিক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্য বিষয়ে পড়াশুনা করবে। শিবচমুর কথায় সে ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের পাশাপাশি বেদশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করবে।

শিবচমুর মা সরিতাদেবী নিজেও একজন সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন— মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই শিবচমু পণ্ডিত রাজকিশোর দলবেহরার কাছে বাঁশী বাজানো শিখছে। ইতিমধ্যে দূরদর্শনসহ বিভিন্ন মঞ্চে বংশীবাদন পরিবেশন করে অনেক বড় বড় মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছে। এত সব করেও শিবচমু নিত্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তাকে আশীর্বাদ করে

বংশীবাদনরত শিবচমু।

বলেছেন, ‘‘আশীর্বাদ কেবলমাত্র প্রেরণা দিতে পারবে। কিন্তু সাধনা সাধককেই করে যেতে হবে। সাধক এখন খুবই ছোট, তাকে অনেক পথ এগিয়ে যেতে হবে, সেজন্য যোগ্য গুরুর প্রয়োজন আর যোগ্য গুরুও সে পেয়েছে। শিবচমু সাধনার বলে তার গুরুর মান রাখতে পারবে।’’

ভারতের ঐতিহ্যগত শিক্ষার পাশাপাশি শিবচমু আধুনিক শিক্ষাও চালিয়ে যাচ্ছে। সংগণক (কম্পিউটার)-এ সে ইতিমধ্যেই অনেক দক্ষতা অর্জন করেছে। গুগুল সার্চ করে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক বিষয়ে সে পড়াশুনা করে। এতকিছু পড়াশুনা করে তুমি কি করবে? —প্রশ্ন করা হলে তার তৎক্ষণাৎ উত্তর— না না, নিজের জন্য আমি এসব কিছুই করছি না। পড়াশুনা শেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে দেশের কাজ করতে চাই। সংস্কৃতের মধ্যে ভারতবর্ষ লুকিয়ে আছে। তাকে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’’

এত প্রেরণা তুমি কোথায় পাও? তার অকপট জবাব--- ‘আমার বাবা-মা’। শিবচমুর বাবা সংস্কৃত ভারতীর সাধারণ সম্পাদক। তাঁর জন্য সারাদেশে আজ কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতী সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে শিখেছে। তাঁর প্রেরণায় ভারতে চারটি সংস্কৃত গ্রাম হয়েছে, সংস্কৃত ভাষার প্রতি স্বাভিমান জেগেছে। মা সরিতাদেবী বহু পুস্তক সংস্কৃতে লিখে সংস্কৃতকে সহজবোধ্য করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের পুত্র শিবচমু বিস্ময়বালক তো হবেই। ■

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com, web : www.calcuttawaterproofing.com

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

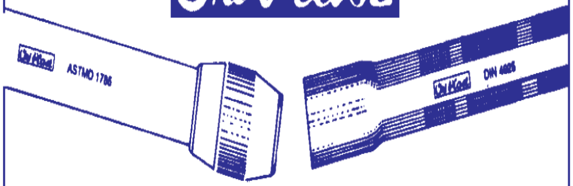

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

“এশিয়া যেমন জগতের ধর্ম ও নীতির প্রসূতি, ভারতও তেমনি এশিয়ার আদর্শসমূহের জন্মদাত্রী। ভারত যদি নিজের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকত, যে গভীর তত্ত্বগুলি শোনার জন্য সমগ্র জগৎ অপেক্ষা করছিল, সে কথা শোনাবার অপর কেউ থাকত না।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

গোপীনাথ মুণ্ডের অকাল প্রয়াণ

গত ৪ জুন সকাল ৬টার পর নিজের সরকারি বাসভবন থেকে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে দিল্লীর পৃথ্বীরাজ রোড ও অরবিন্দ মার্গের সংযোগস্থলে একটা ইন্ডিকা গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারলে সদ্য নিযুক্ত কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গোপীনাথ মুণ্ডে ঘটনাস্থলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোপীনাথ মুণ্ডে ছিলেন মহারাষ্ট্রে বিজেপি'র সাংগঠনিক নেতা। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে তিনি বিজেপি-কে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম রূপকার। এবার মহারাষ্ট্রে ৪৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি ও শিবসেনা জোট যে ৪২টি আসন দখল করেছে, তার পুরো কৃতিত্বই গোপীনাথ মুণ্ডের। এবার এনডিএ সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিদ জেলার নাথরা গ্রামে এক অতি সাধারণ পরিবার মুণ্ডের জন্ম ও বড় হওয়া। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনা চালিয়ে কলেজে পড়তে এসে ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন, পরে প্রমোদ মহাজনের হাত ধরে বিজেপিতে

উত্তরণ। তাঁর অকাল প্রয়াণে দেশের রাষ্ট্রপতি-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী-সহ অনেক কার্যকর্তা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মহারাষ্ট্রের ভূমিপুত্রের অকাল প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় জানান, গোপীনাথ মুণ্ডের জীবনাবসান মহারাষ্ট্রবাসীর কাছে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করবে। উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি বলেন, 'আগামীদিনে গোপীনাথের মতো এক রাজনৈতিক নেতার অভাব অনুভূত হবে'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'জননেতা বলতে আমরা সকলে যা বুঝি গোপীনাথ তাই ছিলেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গোপীনাথ মুণ্ডে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।' এছাড়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, রাজ ঠাকরে, লালকৃষ্ণ আদবানী, মুরলী মনোহর যোশী, রাজনাথ সিং, লালুপ্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাসোয়ান, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক-সহ বেশকিছু নেতা-নেত্রী মুণ্ডের অকাল প্রয়াণে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবারও নীরব রইলেন শোকবার্তা জ্ঞাপনে। ■

প্রয়াত তপন সিকদার

দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২ জুন প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা তপন সিকদার। ১৯৪৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে তাঁর জন্ম। পরে মালদহে বুলবুলচণ্ডী গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। মালদা কলেজে বিদ্যার্থী পরিষদের সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন। ৬৮ সালে পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় আসেন। এখানেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। ১৯৮০ সালে বিজেপি'র রাজ্য সম্পাদক হন। ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রিসভায় টেলিকম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, ২০০২-এ যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ও ২০০৪-এ রসায়ন প্রতিমন্ত্রী হন। তাঁর দুটি কিডনিই বিকল হয়ে যায়। এবারের নির্বাচনেও দমদমে লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন। ভোট পেয়েছিলেন ২ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশ পঞ্চান্নটি। শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য ২৯ মে দিল্লীতে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ২ জুন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তপনবাবুর মৃত্যুর খবরে বিজেপি শিবিরে শোকের ছায়া নেমে আসে। ৩ জুন সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে তাঁর মরদেহ কলকাতায় আনা হয়। রাজ্য কার্যালয়ে তার মরদেহে বিজেপি নেতৃবৃন্দ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাল্যদান করেন। নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

দিল্লীতেই তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাগণ।

৩ জুন বিজেপি'র দলীয় কার্যালয়ে তপনবাবুর মরদেহে বাম সাংসদ মহম্মদ সেলিম মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার বা শাসক দল কারও পক্ষ থেকেই এদিন শ্রদ্ধা জানানো হয়নি তপনবাবুর মরদেহে। যদিও রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবে প্রয়াত তপন সিকদার-এর নাম ছিল। বস্তুত রাজ্য বিজেপি'র উত্থান হয়েছে তপনবাবুর হাত ধরেই। কুশল সংগঠন ও প্রখর বাগ্মী হিসাবে রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচিতি ছিল। ■

সঙ্ঘমাতা শ্রীশ্রী মণিকুন্তলা মায়ের ১১৫তম জন্মোৎসব

গত সোমবার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের সহধর্মিণী সঙ্ঘমাতা মণিকুন্তলা মায়ের ১১৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী পূজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, ভক্তিগীতি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নাটমন্দিরে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে আশ্রমের ছাত্রীবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্যামল সেন, প্রাক্তন রাজ্যপাল ও মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরালভাই। নারীজাতির কল্যাণের ওপর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শ্যামল সেন, প্রাক্তন রাজ্যপাল; তপন মুখার্জী প্রাক্তন বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট, প্রশান্ত চৌধুরী প্রাক্তন অধ্যাপক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সুকুমার দাস প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, অমলেন্দু বিকাশ নন্দী প্রাক্তন অধিকর্তা প্রযুক্তি বিভাগ ও স্বপন মণ্ডল উপপৌরপ্রধান কামারহাটি পৌরসভা প্রমুখ। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সাধু খাঁ ও একক নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পা দে নিক্কন সংস্থা। সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্রহ্মচারী মুরালভাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষিকা মণিকুন্তলা বালিকা বিদ্যালয় আদ্যাপীঠ, ব্রহ্মচারী দীপা দেবী।

সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ৩ জুন মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটায় হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হলো। এই অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং লেখক ডঃ জিষ্ণু বসু প্রাস্তাবিক ভাষণে বলেন, যথার্থ সামাজিক

দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গের সমাপ্তি কার্যক্রম।

আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সর্বদা অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়ে থাকে। উপস্থিত শতাধিক মহিলা-সহ প্রায় এক হাজার স্বয়ংসেবক, শিক্ষার্থী, অনুরাগী ও নাগরিকদের সামনে শ্রী বসু পরম বৈভবশালী ভারতরাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে সঙ্ঘের নিরলস সাধনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রচরিত্র নির্মাণে সঙ্ঘ সদা সচেষ্ট এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজ দেশ এক পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য রাধারমণ চক্রবর্তী স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, ‘‘শৃঙ্খলার সঙ্গে কুড়ি দিনের কঠোর শিবির যাপনের মধ্য দিয়ে শরীর চর্চা ও অন্যান্য অনুশীলন না দেখলে অনুভবে আসত না। বিশেষ করে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে জীবন চর্যার অনুশীলন হয়েছে আধুনিক সময়ে সেটি দেখা যায় না, এরকম প্রয়াসের জন্য সঙ্ঘ নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ।’’

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ৬ জন বিশিষ্ট অতিথি— অবসর প্রাপ্ত আই এ এস এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাধাকান্ত ত্রিপাঠি,

মার্চেন্ট নেভির অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সুভাষ ভৌমিক, অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস এবং আই জি পি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস এবং ডিজিপি রঞ্জিত কুমার মহান্তি, দ্য পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক চন্দন মিত্র এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের (সাধারণ) বর্গ কার্যবাহ নিরঞ্জন মাকুড় ও বিশেষ বর্গের বর্গ কার্যবাহ সুভাষ নন্দী তাঁদের প্রতিবেদন পাঠ করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্গ অধিকারী অনিল ঘোষ, দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। শারীরিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন মুখ্যশিক্ষক গৌরাঙ্গ খাঁড়া এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন দক্ষিণবঙ্গ কার্যবাহ ডঃ তিলক রঞ্জন বেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হাওড়া জেলা কার্যবাহ দীপঙ্কর নস্কর। একই দিনে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের দ্বিতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ও

উত্তরবঙ্গের সমাপ্তি কার্যক্রমে অধিকারীগণ।

উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমে প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়! প্রায় এক হাজার সঙ্ঘানুরাগী ও মাতৃমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি রক্ষা সমিতির প্রস্তুতি সভা ও গণ-কন্‌ভেনশন

সমিতির নবদ্বীপ ক্ষেত্র বিস্তারের ১২ মে ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২৭ মে ২০১৪ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় 'আরতি ভবন' সভাস্থলে। নবদ্বীপের বিভিন্ন স্তরের নাগরিক সমাজ--- বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী আগ্রহের সঙ্গে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সদস্য, ক্লাব প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক মণ্ডলী। উপস্থিত সদস্যগণ শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে এই মহতী-কর্মোদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমিতির প্রশংসা ও পূর্ণ সাফল্য কামনা করেন। শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দরিদ্র মেধাবীদের জন্য), শ্যামাপ্রসাদের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সময়ের সাতরং' প্রকাশনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা কর্মসূচি সভায় ঘোষণা করা হয়। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সভার সদস্যগণ করতালি-সহ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আগামী ২৩ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবসে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের ফল ঘোষণা হবে— এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভায় ঘোষণা করা হয়েছে। সভার সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক শ্যামল রায় সমবেত সদস্যদের সামনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জীবনী, শিক্ষা, সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ড ও সমাজসেবামূলক কাজের উল্লেখ করেন। বহু বিস্ময়কর অজানা তথ্য ডঃ মুখার্জি সম্বন্ধে প্রকাশের লক্ষ্যে তিনি শিক্ষাদপ্তরের কাছে দাবি রাখেন যে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পাঠ্যসূচিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ-এর জীবনী ও কর্মকাণ্ডকে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই উদ্যোগকে ক্রমে এক সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনেক দেরিতে হলেও এই সাহসী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য 'শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি রক্ষা সমিতি'-র সচেতন উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন উপস্থিত সকলেই।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি সংখ্যা ১০.০০ টাকা

‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ রবিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত’র সহধর্মিণী নীলিমা সেনগুপ্তকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান লম্বোদরপুর গ্রামের সেনগুপ্ত পরিবারের কুলদেবতা শ্রীশ্রীধর জিউ মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো।

অনুষ্ঠানে তিনবার ওঁ ধ্বনি দিয়ে শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন প্রাক্তন রাজ্য সরাকারি আধিকারিক অচিন্ত্য সরকার। নীলিমা দেবীর পুত্ররা সকলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। একজন প্রাক্তন প্রচারক ও একজন বীরভূম জেলার প্রাক্তন শারীরিক প্রমুখ। বর্তমানে সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য সুরজিৎ সেনগুপ্ত মায়ের সম্বন্ধে অনুভব বর্ণনা করেন। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলী দাস। মা-কে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজন করা হয়। বস্ত্র, নামাবলি, গীতা, বেতের ছড়ি, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। সমগ্র মাঙ্গলিক কার্যক্রমটি সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু সেনগুপ্ত-পরিবার, উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী ও মায়েদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

একল বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২৮ মে ও ২৯ মে বসিরহাটে ৯০ জন আচার্যা ও ৫০ জন অভিভাবককে নিয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। শিবিরে বক্তব্য রাখেন বসিরহাট জেলা কার্যবাহ সুকুমার বৈদ্য।

***

গত ২৬ মে ও ২৭ মে হিঙ্গলগঞ্জ থানার গোবিন্দকোচীতে ৯০ জন আচার্যাকে নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হলো। শিবিরে ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বসিরহাট জেলার সহ-কার্যবাহ তারকনাথ ঘোষ।

একল বিদ্যালয়ে বীর সাভারকর জন্মদিন পালন

গত ২৮ মে বুধবার একল বিদ্যালয় পক্ষ থেকে বসিরহাটে বীর সাভারকর জয়ন্তী পালন করা হয়। শতাধিক আচার্যা ও নাগরিকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বীর সাভারকর সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪-পরগণা বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ অবসর প্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুভাষচন্দ্র তরফদার। বারাসাত অঞ্চল অভিযান প্রমুখ প্রভাস মুখার্জিও উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার হালিশহর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুশান্ত সিনহা (পল্টনদা) গত ১৮ মে রাতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৯২ সালে রামমন্দির আন্দোলনের তিনি একজন সক্রিয় সৈনিক ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

মালদহের স্বয়ংসেবক প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রলয় কুমার দাসের সহধর্মিণী রুণা দাস গত ২৭ মে মঙ্গলবার সকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। তিনি স্বামী, কন্যা ও বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

***

শিলিগুড়ির প্রবীণ স্বয়ংসেবক শঙ্কর আগরওয়াল পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোষাধ্যক্ষ, সারদা শিশুতীর্থ সমিতির সদস্য-সহ বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

***

গত ৩ জুন সকালে কলকাতার কেশব প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক যোগেন্দ্র শ্রীবাস্তব

(খোকাদা) ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা এলাকায় তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা, নাতি-নাতনি এবং অনেক গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

বিশ্বকাপের সর্বকালীন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেলে, ইউসেবিও, পুসকাস— চিরকালীন বিশ্ব ফুটবলের ‘থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’। জুলে রিমে ট্রফির ইতিহাসে তিন বর্ণময় চরিত্র। তিনজনের মধ্যে অবশ্যই পেলে সর্বোত্তম। ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপে আবির্ভাব আর আবির্ভাবেই ‘ভিনি, ভিডি, ভিশি’। ১৯৫৮-র বিশ্বকাপের আসর বসেছিল সুইডেনে। ব্রাজিল তখন মণিমানিক্যখচিত দল। ডিডি, ভাবা, জালমা সান্টোস, অ্যামারাল্ডো, জাগলোর নামে বাচ্চা পেলে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ৫-২ গোলে জয়ের কারিগর ছিলেন ১৭ বছরের বাচ্চা ছেলেটি। দুটো অসাধারণ গোল করেছিলেন, করিয়েছিলেন আরো একটি। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ‘কালো মানিককে’। সান্টোস ক্লাবকে বিশ্বসেরা করেছেন। ব্রাজিলকে ৬২, ৭০-এ বিশ্বজয়ী করেছেন। পেলের ব্রাজিল ‘সোনার পুরী’ বা জুলে রিমে ট্রফি চিরতরে নিয়ে যায় নিজ ঘরে। তবে কয়েক বছর পর ট্রফিটি ক্যাবিনেট থেকে চুরি যায়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ এই ১২ বছর ব্রাজিল অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছে।

জাতীয় দল ও ক্লাবের হয়ে হাজারের ওপর গোল করেছেন এডসন অ্যারান্টেস ডু নাসিমেন্টো বা পেলে। ১৯৬২-র বিশ্বকাপে পেলে-গ্যারিঞ্চা জুটি যে ফুটবলটা খেলেছিলেন তা চিরকালীন রূপকথায় স্থান পেয়েছে। ৫২-র চেকোশ্লোভাকিয়া বিশ্বকাপটা গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ বলেই মনে করা হয়। গ্যারিঞ্চার ক্ল্যাসিকাল উইংপ্লে আর ‘মিডল থার্ডে’ পেলের অলরাউন্ডার পিভটাল ভূমিকা দেখে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা চমকে উঠে বলেছেন এ যেন ‘জাদু বাস্তবতা’ বা ‘ম্যাজিক রিয়েলিজম’। ৬৬-র বিশ্বকাপে পেলেকে খেলতেই দেওয়া হয়নি। পর্তুগাল, ইংল্যান্ড ম্যাচে ডিফেন্ডাররা নৃশংস ভাবে ট্যাকল করে মাঠ থেকে বের করে দেন পেলেকে। এভাবেই ফুটবলের জন্মদাতা দেশ ইংল্যান্ড দেশের মাঠে বিশ্বকাপ জিততে সমর্থ হয়েছিল। আর ৭০-এ ভূপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত মেক্সিকো সিটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপে পেলে প্রমাণ করে দিলেন তিনি ও ফুটবল যেন

পেলে

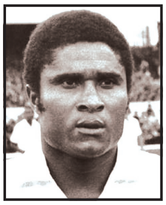
ইউসেবিও

পুসকাস

সমার্থক। ফিফা প্রেসিডেন্ট স্যার স্ট্যানলি রাউস পেলের অতিমাত্রিক খেলা দেখে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন ‘ইংরাজি সাহিত্য ও শেক্সপীয়ার’ যেমন অভিন্ন তেমনি বিশ্বফুটবল ও পেলে পরস্পরের সম্পূরক।

পেলের পূর্ববর্তী বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার ছিলেন হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক পুসকাস। গোটা ৫০-এর দশক জুড়ে বিশ্ব জুড়ে যে ‘ম্যাজিক ম্যাগায়ার্স’ রাজ চলেছিল তার প্রধান ভরকেন্দ্র ছিল ‘গ্যালপিং মেজরের’ (পুসকাসের এই উপমায় বিশ্বজোড়া পরিচিতি) মাথা ও পা ‘গ্রাউন্ড’ ও ‘এরিয়াল’ বল পজেশন সহ স্কোরিং দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। ৫২, ৫৬ পরপর দুবার অলিম্পিক ফুটবলে সোনাজয়ী হাঙ্গেরির মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন পুসকাস। পাশে পেয়েছিলেন জিদেকুটি, ককসিস, বজসিককে। সবার উপরে ছিলেন গুস্তাভ সেবেসের মত কোচ। ৫৪-র বিশ্বকাপ ফুটবলে হট ফেভারিট হিসেবে শুরু করেও ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের খেসারত দিয়ে ৪-২ গোলে হেরে যায় পুসকাসের হাঙ্গেরি। অথচ এই পশ্চিম জার্মানিকে গ্রুপ লিগে ৮-৩ গোলে হারিয়েছিল হাঙ্গেরি। ইংল্যান্ড তখন বিশ্ব ফুটবলে এক বড় শক্তি। সেই ইংল্যান্ডকে নিজের মাঠে কচুকাটা করে দিয়েছিল হাঙ্গেরি। স্বয়ং স্ট্যানলি ম্যাথুজকে বলতে বাধ্য করেছিলেন— পুসকাস মানুষ নন, অন্য গ্রহের জীব।

পুসকাসের হাঙ্গেরি আর পেলের ব্রাজিলকে বলা হয় বিশ্বফুটবলের ইতিহাসে সর্বকালীন সেরা দেশ। আধুনিক ফুটবলের যাবতীয় বিবর্তন ঘটিয়েছে এই দুই দেশই। তবে একক দক্ষতায় যে ফুটবলারটি দেশ-কালের ঊর্ধ্বে উঠে ফুটবলের প্রকরণটাই বদলে দিয়েছিলেন তার নাম হলো ইউসেবিও। পেলে যদি ‘কালো মানিক’ হন তবে সমসাময়িক ইউসেবিও ‘কালো হীরে’। ৫৮, ৭০-এর বিশ্বকাপ যেমন পেলের, ৬২-র বিশ্বকাপ যেমন গ্যারিঞ্চার, তেমনি ৬৬-র বিশ্বকাপ পর্তুগালের ইউসেবিওর। একার কৃতিত্বে পর্তুগালকে টেনে নিয়ে যান সেমিফাইনাল পর্যন্ত। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ম্যাচে এক সময়ে ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় অতিপ্রাকৃত ফুটবল খেলে ম্যাচ বের করে নেন ৫-৩ গোলে জিতে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। পেলের মতো চিরকাল স্বদেশের ক্লাবে খেলে গেছেন। বেনফিকারের ইউরোপ সেরা করেছে। গতি, শক্তি, স্কিলের চমৎকার সমন্বয় ছিল তার খেলায়। টপ বক্সে ৪-৫ জন ডিফেন্ডারকে হেলায় ড্রিবল করে ছিটকে দিয়ে অসাধারণ সব গোল করে গেছেন। যে সব গোল ফুটবল গবেষকদের কাছে গবেষণার বিষয়।

উল্লেখ্য পুসকাস, পেলে, ইউসেবিও প্রায় একই সময়ের খেলোয়াড়। পুসকাস একটু আগের। আর এই সময়টাকেই বিশ্ব ফুটবলের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কিসব খেলোয়াড় উঠে এসেছেন! এই প্রতিবেদনে তাঁদের অনেকের নাম করা হয়েছে। এর বাইরে রয়ে গেছেন অসংখ্য ‘জিনিয়াস’। ফ্রান্সের বসটেইন, রেমন্ড কোপা, চেকোস্লোভাকিয়ার জোসেফ ম্যাগনেট, হাঙ্গেরির পপলুহার, ইতালির লুইনি রিভা, গিসপান রিভেরা, আয়ার্ল্যান্ডের জজবেস্ট, জার্মানির উয়ে সিলার, ফ্রানজ বেকেনবাউসারকে চিরকালীন স্থান দেওয়া হয়েছে ‘হল অব ফেমে’। পুসকাসের সমসাময়িক আলফ্রেডো ডি স্টিফানোকেই বা ভোলা সম্ভব কি? আর্জেন্টিনা জাত ডি স্টিফানো স্পেনের নাগরিকত্ব নিলেন আর নিয়তি নির্দিষ্ট দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেলেন। কোনো বিশ্বকাপেই খেলা হয়ে ওঠেনি ডি স্টিফানোর। দু-দুবার স্পেন বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে। তবে বিশ্বকাপ না খেললেও রিয়াল মাদ্রিদকে ইউরোপীয়ান ক্লাব চাম্পিয়নশিপে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তার মূল্যায়ন যথার্থতাই করেছে ফিফা, ফুটবলের দেবদূত হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে।

শব্দরূপ-৭১১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বৃত্রসংহারে বৃত্রাসুরপত্নী, **৩.** বর্ধমানের এই গ্রামে কবি নজরুলের জন্ম, **৪.** বেদানা-জাতীয় ফলবিশেষ; ডালিম, **৫.** তারাশংকরের চলচ্চিত্রায়িত বিখ্যাত উপন্যাস, **৬.** অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ; যাহার কাছে কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়, **৮.** টাঁকশাল, **১০.** চন্দ্রের ষোড়শভাগের একভাগ, **১১.** সাপের ঝাঁপি, **১৩.** কার্তিকেয় পত্নী, **১৪.** দুর্যোধনের কন্যা।

উপর-নীচ : ১. '—, বাক্য, মাণিক্য', **২.** দাবিত্যাগ, **৩.** অয়স্কান্ত প্রস্তর, লৌহ আকর্ষণ ও দিক নির্ণয় করে, **৫.** চড়ুই পাখি, **৭.** পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাচীন নগরী, রাজা জনমেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, **৯.** কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উল্লিখিত ধনপতি সদাগরের প্রথম পত্নী, **১০.** সগরবংশ ধ্বংসকারী মুনিবিশেষ, **১২.** রেণু, সূক্ষ্ম অংশ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	ম	ল	মা	স	■	গ
অ	ব্য	য়	■	■	গ	■	র
■	স্ত	■	রা	■	র	ক	বা
■	বা	ধা	ই	■	■	ন	■
■	গী	■	■	ম	ড়	ক	■
অ	শ	ন	■	ঘা	■	চূ	■
যো	■	কু	■	■	হ	ড়	পা
ধ্যা	■	ল	খি	ন্দ	র	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

❑ ৭১১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
50g
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

পদ্মনাভস্বামী মন্দির রক্ষার জন্যে হিন্দুদের সক্রিয় হওয়া দরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আবার খবরে এসে গেছে জোরালোভাবে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির সম্পর্কে কথাবার্তা। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রতিনিধি প্রতিবেদন ও প্রস্তাব দিয়েছেন। শ্রী সি ভি আনন্দ বসু প্রথম রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রচারের দিকে তাঁর আগ্রহ প্রবল ছিল, তার দরুনই মন্দিরে সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। আলোচনা মতামত পরামর্শ যেমন ছিল, তেমনি গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারও। মনে হয় তিনি নিয়মনিষ্ঠভাবে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পেশ করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট সবদিক বিচার বিবেচনা করে এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে হয়তো। এছাড়াও আরও অনেকরকম ভাবনাচিন্তা আছে। এর ফলে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে। প্রায় আকস্মিক ও অদ্ভুতভাবে এর বিপরীতেও কিছু কথাবার্তা উঠে এসেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আনন্দ বসুর ভাবনা ও উদ্যোগের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য আনন্দ বসু নিজের স্বার্থে সব কাজ করছেন আগ বাড়িয়ে।

দ্বিতীয় পর্বের টাকা এসেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রতিনিধির প্রতিবেদন পেশ করার পর। খুব কম লোকজনই প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে পড়েছেন। কিংবা পড়েছেন সেইটুকুই যতটুকু কাগজে বেরিয়েছিল। এখন মুখ্যমন্ত্রী পি সি জর্জ ভরসা করেছিলেন চিফ হুইপ টমাস আইজাকের। ভবিষ্যতে যিনি কেরলের বামগণতান্ত্রিক মোর্চার অর্থমন্ত্রী হতে পারেন। সমস্ত বিতর্ক এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে। রাজপরিবারের লোকজন রীতিমতো অসন্তুষ্ট। তাঁরা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এটাই প্রমাণ করার জন্যে যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রতিনিধির সমস্ত কাজ সঠিক নয়। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে নিজের স্বার্থ থেকে যায়। মন্দিরের স্বার্থ বড় হয়ে উঠেছে। ভক্তদের স্বার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রভাবশালী গোষ্ঠী জোরালো ভাবে বলছে, হয় মন্দির সরকার গ্রহণ করুক কিংবা মন্দিরের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের জন্যে কার্যনির্বাহক কমিটি সরকার গঠন করুক। তবে অনেকেই চায় না কোনো ধর্মীয় সংস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হোক। যেসব মন্দির সরকারি তত্ত্বাবধানে রয়েছে সেগুলি কোনোরকম উজ্জ্বল রূপ নেয়নি। যেমন গুরুভায়ুর মন্দিরে ক্রমাগত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। যা প্রত্যাশিত ছিল না।

অবস্থাটা কি? হিন্দু স্বার্থের কথা ভেবে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের পরিচালক পি পরমেশ্বর গত ২ মে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলেছেন একমাত্র হিন্দুরাই বিশ্বাস করে বিচার বিভাগের সুযোগ্য প্রতিনিধির কঠোর তত্ত্বাবধান থাকলে মন্দিরকে প্রশাসনিক দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব। এটা বাস্তব সত্য কথা, শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির ঘুমন্ত নয়। আরও একটা কথা, হিন্দু সমাজ দীর্ঘদিন নীরব দর্শক থাকতে পারে না। সময় এসেছে একসঙ্গে ও বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদের, যা তাদের ন্যায্য অধিকার, যাতে মন্দির পরিচালন কমিটি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

সম্প্রতি মন্দিরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে জেলা শাসক বিজু প্রভাকরের নির্দেশে। কিছুদিন আগে তাঁকে মন্দির কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নিয়োগ করা হয়েছে। মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশ পথে খোঁড়াখুঁড়ি করে মাটির তৈরি যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তা দেখে অনুমান করা হচ্ছে তা নবম শতাব্দীর। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখন কেরল সরকারের কাছে আবেদন করেছে, একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের জন্যে, যাঁদের নির্দেশে খনন কাজ এগোতে পারে। আদালত একটা কার্যনির্বাহী কমিটি গড়ে দায়িত্ব দিয়েছে ২৬ এপ্রিল বিচারপতি কে পি ইন্দিরার নেতৃত্বে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তিনি সরকারিভাবে মন্দির প্রশাসনের প্রধান হবেন। ■

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
16 June - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা